সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	1
পবিত্র কুরআন	2
পবিত্র হাদীস	2
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	2
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে জন আলেকজান্ডার ডুইয়ের মোকাবেলা এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামে মহান বিজয়ের পদধ্বনি	3
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আরবদের মধ্যে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রচার	7
লাহোরে প্রমূখ ধর্মসমূহের সম্মলনে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের মহান বিজয়	15
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহান কীর্তি	22
অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়	34

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইসলামের সেবা

সম্পাদকীয়

পবিত্র কুরআন মজীদ তথা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে উম্মতে মহম্মদীয়ার মধ্যে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। পবিত্র কুরআন মজীদের সুরা জুমার ৪ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় আঁ হযরত (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমণের কথা উল্লেখ আছে।

মহানবী (সা.) বলেছিলেন-

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ
فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

অর্থাৎ- " হে মুসলমান জাতি! যখন তোমরা তাঁর সংবাদ পাবে তাঁর হাতে বয়াত করো, যদি তোমাদেরকে বরফের পহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা ও মাহদী।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল)

মহানবী (সা.) বলেন - "তোমাদের মধ্যে যারা ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেখতে পাবে সে যেন তাঁকে আমার সালাম বলে দেয়।"

(দুররে মানসুর, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী)

আল্লাহ তা'লার অপার করুণা যে তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে উম্মতে মহম্মদীয়ায় ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) ইসলামকে একটি জীবিত ধর্ম রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি (আ.) ঐশী আদেশ প্রাপ্ত হয়ে ইসলামের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ১৮৮৯ সালের ২৩ শে মার্চ 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

পবিত্র কুরআন মজীদ ও হাদীস অনুযায়ী মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাজ নিম্নরূপ।

১) ন্যায়ের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের অবসান ঘটানো

২) ইসলামের উপর বহিরাগত আক্রমণকে প্রতিহত করে সেগুলির যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেওয়া। এবং ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে মিথ্যা ধর্মের আধিপত্যের বিনাশ করা। বিশেষ করে খৃষ্টবাদের আধিপত্য ধ্বংস করা।

৩) হৃত ঈমানকে পুনরুদ্ধার করা।

এই তিনটি মূখ্য কাজ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। এবং খোদার কৃপায় তিনি (আ.) সমস্ত কাজ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। এবিষয়ে অন্যরাও স্বীকারুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

" মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের মৃত্যু থেকে এমন নয় যাকে ভোলানো যেতে পারে এবং তাঁর কীর্তি মুছে ফেলার জন্য তাকে কালে গহ্বরে অর্পণ করা যেতে পারে। এমন ব্যক্তিত্ব যারা ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক জগতে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধন করেছেন প্রত্যেক দিন পৃথিবীতে আসেন না। ইতিহাসে এমন মহান পুরুষ খুব কমই হয়েছেন।"

বিরোধীদের সামনে বিজয়ী সেনাপতির মত তাঁর কর্তব্য পালন আমাদের তাঁর অবদান স্বীকার করতে বাধ্য করে। খৃষ্টান ও আর্যাদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেবের রচনাগুলি সর্বস্বীকৃত ও সমানভাবে সমাদৃত এগুলির কোন বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপনের মুখাপেক্ষী নয়। এই পস্তকগুলির প্রতি সম্মান জানাতে আমরা বাধ্য।

(তারিখে আহমদীয়াত, দ্বিতীয় ভাগ পৃষ্ঠা: ৫৬০- ৫৬১)

বর্তমানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এ পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের ২০৯ টি দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ইসলাম আহমদীয়াত সারা বিশ্বে দ্রততার সঙ্গে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে। তাঁর জামাত বিশ্বকে হানাহানি ও নৈরাজ্য থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে আহ্বান করছে। ধন্য সেই যে এটিকে স্বীকার করে।

এই বিশেষ সংখ্যায় ইসলাম সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ সেবার কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উর্দূ মূল প্রবন্ধ থেকে বাংলায় অনবাদ করা হয়েছে। আশা করি পাঠক বর্গ উপকৃত হবেন।

(সম্পাদক)

ধন্য সে যে আমাকে চিনেছে, আমি খোদার সমস্ত পথের মধ্যে শেষ পথ এবং আমি তাঁর সমস্ত জ্যোতির মধ্যে শেষ জ্যোতিঃ। অভাগা সে যে আমাকে ত্যাগ করে কেননা আমি ছাড়া সবই অন্ধকার।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এ অধমকে মসীহের নাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়।

"অতএব এ অধমের সময়ে অন্যান্য বুযুর্গের চরিত্রগত সাদৃশ্য ছাড়াও হযরত মসীহের চরিত্রের সাথে এক বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ বারাহীনে আহমদীয়াতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ চরিত্রগত সাদৃশ্যের দরুনই এ অধমকে মসীহের নাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়। সুতরাং আমি ক্রুশ ভাঙ্গার ও শূকর বধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমি আকাশ থেকে সেই পবিত্র ফিরিশতাসহ অবতীর্ণ হয়েছি, যারা আমার ডানে-বামে আছেন। আমার খোদা যিনি আমার সাথে আছেন, তিনি তাদেরকে আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক যোগ্য হৃদয়ে প্রবেশ করাবেন করাচ্ছেন। আমি যদি চুপও থাকি এবং আমার কলম লিখা থেকেও বিরত থাকে তবুও আমার সাথে যে ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয়েছেন তারা তাদের কাজ বন্ধ করতে পারেন না। তাদের হাতে বড় বড় হাতুড়ি রয়েছে। এগুলো ক্রুশ ভাঙ্গার ও সৃষ্টি পূজার মূর্তি ধ্বংস করার জন্য দেওয়া হয়েছে।"

(ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১, টীকা)

****

যখন খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠালেন সেই সময় থেকেই পৃথিবীতে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে।

যে কাজের জন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন সেটি হল এই যে, খোদা তা'লা ও তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের মধ্যে যে পঙ্কিলতা জমে আছে আমি যেন সেগুলি দূর করে ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করি এবং সত্য প্রকাশের মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে চুক্তির ভিত্তি রাখি। এবং সেই সকল ধর্মীয় সত্যতা যা জগতের চক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছে সেগুলিকে প্রকাশ করি। আর সেই আধ্যাত্মিকতার নমুনা দেখাই যা প্রবৃত্তির অন্ধকারের নীচে চাপা পড়ে গেছে। এবং আমি যেন সেই অনুভুতির কথা বর্ণনা করি যখন খোদার শক্তিসমূহ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে মনোযোগ বা দোয়ার মাধ্যমে বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করে যা কেবল দাবি সর্বস্ব হয় না। এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পবিত্র এবং আলোকময় তৌহিদ যা যাবতীয় প্রকারের শিরক-এর স্পর্শ থেকে মুক্ত এবং যা এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে জাতির মধ্যে যেন পুনরায় স্থায়ী চারা রোপন করি। আর এ সব কিছু আমার শক্তিতে হবে না বরং সেই খোদার শক্তিতে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা। আমি লক্ষ্য করছি যে, একদিকে খোদা তা'লা স্বহস্তে আমার প্রতিপালন করে এবং ওহীর দ্বারা সম্মানিত করে আমার হৃদয়ে এই উৎসাহের সঞ্চার করেছেন যে, আমি যেন এই ধরণের সংশোধনের জন্য দন্ডায়মান হই। অপরদিকে তিনি অন্তরসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আমার কথা মান্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আমি লক্ষ্য করছি যে, যখন খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠালেন সেই সময় থেকেই পৃথিবীতে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকায় যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্বের গুণগ্রাহী ছিলেন এখন তাদের গবেষকরা নিজেদেরকে এই মতবাদ থেকে পৃথক করে নিচ্ছে। এবং সেই জাতি যাদের পূর্ব পুরুষ পুরুষানুক্রমে পৌত্তলকিতা করে আসছিল এবং দেবতাদের উপর উৎসর্গিত হচ্ছিল তাদের অনেকে এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে, মূর্তি কোন মূল্য রাখে না। আর যদিও তারা এখনও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তারা কেবল কিছু বিষয়কে প্রথা হিসেবে গ্রহণ করে বসে আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হাজার হাজার নিরর্থক প্রথা, বিদাত ও শিরকের রজ্জু তারা নিজেদের গলা থেকে বের করে ফেলেছে এবং একত্ববাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। আমি আশা রাখি, কিছু কাল পরে ঐশী কৃপা তাদের অনেককেই বিশেষ হাত দিয়ে ঠেলে প্রকৃত ও পূর্ণ তৌহিদের শান্তিকুঞ্জে প্রবেশ করাবে যার সাথে পূর্ণ ভালবাসা, পূর্ণ ভীতি ও পূর্ণ মারেফাত প্রদান করা হয়। আমার আশা নিতান্ত অমূলক নয়, বরং আমি খোদার পবিত্র ওহী দ্বারা এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি। এই দেশে খোদার প্রজ্ঞা এই কাজ করে দেখিয়েছে যাতে তিনি অচিরেই বিভিন্ন জাতিকে এক ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত করেন এবং শান্তি ও চুক্তির দিন নিয়ে আসেন। "

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ১৮১)

****

আমি এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যাতে মানুষদের ঈমানকে শক্তিশালী করি এবং মানুষের সামনে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখাই।

আমি এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যাতে মানুষদের ঈমানকে শক্তিশালী করি এবং মানুষের সামনে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখাই। কেননা, প্রত্যেকটি জাতির ঈমানী অবস্থা যারপরনায় দূর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারা পরকালকে কেবল একটি কল্প-কাহিনী মনে করে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মগত অবস্থান দ্বারা অব্যক্তভাবে বলছে যে, সে জগত ও জগতের আড়ম্বর সম্পর্কে যেরূপ ঈমান রাখে, জাগতিক উপকরণের উপর যেরূপ তার আস্থা রয়েছে সেই আস্থা ও ঈমান খোদা তা'লা ও পরকাল সম্পর্কে কোনভাবেই নেই। তারা মুখে অনেক কিছুই বলে, কিন্তু অন্তরে জগতের ভালবাসা ছেয়ে আছে। হযরত মসীহ অনুরূপ অবস্থাতেই ইহুদীদেরকে পেয়েছিল। আর যেরূপ দূর্বল ঈমানের বৈশিষ্ট্য- ইহুদীদের নৈতিকতাও বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। খোদার প্রতি তাদের ভালবাসাও ছিল নিরুত্তাপ। এখন আমার যুগেও একই অবস্থা। অতএব, আমিও প্রেরিত হয়েছি, যাতে সত্য এবং ঈমানে যুগ ফিরে আসে মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। এই কাজগুলিই আমার অস্তিত্বের কারণ। আমাকে বলা হয়েছে যে, অনেক দূরে সরে যাওয়ার পর পুনরায় আকাশ পৃথিবীর নিকটে হবে। সুতরাং আমি এই বিষয়গুলির সংস্কার করব এবং এই কাজগুলির জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা: ২৯১, টীকা)

****

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে জন আলেকজান্ডর ডুই-এর মোকাবেলা এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের মহান বিজয়ের পদধ্বনি।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে সমগ্র জগতের ধর্মসমূহের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে বলেন, 'জারিউল্লাহ ফি হুলালিল আম্বিয়া'। এই কারণে সমস্ত ধর্মের মতবাদের সংশোধন করা তাঁরই দায়িত্ব ছিল। পরিণামে সমস্ত ধর্মের লোকের সাথে তাঁর মোকাবেলাও অবধারিত ছিল। মুসলমান উলেমা ও নেতাদের সঙ্গে দোয়া ও কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা লেখার প্রতিযোগীতা হওয়ার পাশাপাশি হিন্দু ও আর্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও নিদর্শন প্রকাশ, দোয়া গৃহীত হওয়া এবং নিজের ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করার অসংখ্য সুযোগ লাভ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মোকাবেলিয়া সাআদুল্লাহ লুধিয়ানবী, পন্ডিত লেখরাম পেশাওয়ারী, পাদরী আব্দুল্লাহ্ আথম ও জন আলেকজান্ডার ডুইয়ের মত ঘোর বিরোধীর জন্ম হয় এবং তারা তাঁর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় ভারতে খৃষ্টান পাদরীরা ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্বেষ পোষণ করত। অচিরেই তারা সমগ্র ভারতবর্ষকে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীতে পরিণত করার এবং ভারতের সমস্ত শহরের ক্রুশের পতাকা পুঁতে দেওয়ার দাবী করছিল। তাদের এই আস্ফালনের স্রোতের বহু মুসলমান এমনকি উলেমাবর্গও খড়কুটোর ন্যায় ভেসে গিয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়ে এমন ভাবে খৃষ্টান পাদরী ও প্রচারকদের সঙ্গে মোকাবেলা করলেন যে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী আমেরিকা ও ইউরোপে পৌঁছাতে শুরু করল। তিনি ভারতীয় নবী হিসেবে আখ্যায়িত হলেন। তাঁর (আ.) খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখে ইসলাম বিদ্বেষী একব্যক্তি জন আলেকজান্ডা ডুই মোকাবেলায় দন্ডায়মান হল। এই মোকাবেলার পরিণামে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের জয়ধ্বনি মুখরিত হল।

জন আলেকজান্ডার ডুই আদতে স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা ছিল। শৈশবে পিতা-মাতার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসে। ১৮৭২ সালে একজন সফল বক্তা এবং পাদরী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৮ সনে আমেরিকার নতুন জগতে নিজের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে সান ফ্রান্সিসকো সংলগ্ন অঞ্চলে সফল জলসা সম্পন্ন করার পর ১৮৯৩ সনে শিকাগোয় তার বিশেষ সক্রিয়তা দেখা যায়। এরপর লিউস অব্ হেলিং পত্রিকা শুরু করে। খুব অল্প সময়ে সে আমেরিকার দিক-দিগন্তে খ্যাতি লাভ করে। তার মান্যকারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মি.ডুই নিজের খ্যাতি ও সফলতা দেখে ২২ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬ সনে একটি সম্প্রদায় গঠন করে যার নাম দেয় 'ক্রিশ্চিয়ান ক্যাথলিক চার্চ'। ১৮৯৯ কিম্বা ১৯০০ সালে সে নবুয়তের দাবি করে এবং নিজের দলের নাম 'ক্রিশ্চিয়ান ক্যাথলিক অ্যাপালস্টিক চার্চ' রাখে।

(তালখীস, তারিখ আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪১)

জন আলেকজান্ডার ডুই ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল এবং ইসলামকে ধরাপৃষ্ট থেকে মুছে দেওয়ার মনঃবাসনা রাখত। সে লোকদেরকে খৃষ্টীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়ত। সে লিখে, " আমি যা কিছু তোমাদেরকে বলব, সেই পথ তোমরা অনুসরণ করবে, কেননা, আমি খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পায়গাম্বার।"

(আয ইবরাত নাক আঞ্জাম, পৃষ্ঠা-২৫)

যেহেতু এইব্যক্তি আমেরিকার একজন ধনি ও প্রভাবশালী বক্তি ছিল, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খ্যাতনামা ছিল, তাই সে নিজের উন্নতির গতি বিবেচনা করে ১৯০১ সালে সাহেউন নামে একটি শহর গড়ে তোলে। এই শহর, সৌন্দর্য্য, বিস্তৃতি, অট্টলিকা ও ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকা ও ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং অচিরেই আমেরিকার প্রধান শহরগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে। ডুইয়ের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে নিজের প্রচার ছড়িয়ে দেওয়া, নিজের মতবাদ প্রচার করা এবং পৃথিবীর মনোযোগ ইসলামের পরিবর্তে খৃষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা। সে এই কাজ নিজের পত্রিকার মাধ্যমে করত। এই কারণে সে আমেরিকায় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই সম্পর্কে শিকাগোর একজন প্রফেসর লেখেন,

" বিগত বারো বছরে খুবই কমই ব্যক্তি এমন হয়েছে যে আমেরিকার পত্রিকায় এমন স্থান দখল করেছে যেরূপ জন আলেক জান্ডার ডুই করেছে।"

আলেক জান্ডার ডুই নিজের পত্রিকার মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.)-এর বিরোধীতায় কোমর বেঁধে নামে। সে সবসময় এই চিন্তায় করতে থাকত যে, কীভাবে ইসলামকে ধরাপৃষ্ট থেকে ধ্বংস করা যায়। সে নিজের পত্রিকায় লেখে,

"আমি ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান জাতিকে সতর্ক করতে চাই যে, ইসলাম কোন মৃত ধর্ম নয়, বরং ইসলাম শক্তিতে ভরপুর ধর্ম, যদিও ইসলামকে অবশ্যই ধ্বংস হওয়া উচিত। মহামেডিনিজম অবশ্যই ধ্বংস হওয়া উচিত, কিন্তু তা জরাগ্রস্ত ল্যাটিনি খৃষ্টধর্মের সাহায্যে ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়, আর না শক্তিহীন গ্রীক দেশীয় খৃষ্টধর্মের দ্বারা সম্ভব আর না তা ঐ সমস্ত মানুষদের ভারাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত খৃষ্টবাদের দ্বারা সম্ভব যারা মসীহকে কেবল নামসর্বস্ব মান্য করে এবং পাপী, দুরাচারী ও অত্যাচারীর ন্যায় জীবন যাপন করে।"

(লাইভস অব হিলিং, ২৫ শে আগষ্ট, ১৯০০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন ডক্টর আলেক জান্ডার ডুইয়ের এই ধরণের দাবি সম্পর্কে অবগত হলেন যে, সে ইসলামকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখে এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে এবং সেই কাজের জন্য নিজের পত্রিকাকেও নিয়োজিত করেছে, তখন তিনি (আ.) তিনি দায়িত্ববোধের তাড়নায় ১৯০২ সালের ৮ ই আগস্ট ডুইকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও এবং শ্রীনগরে তাঁর কবরের কথা উল্লেখ করে তাকে মোবাহিলার (দোয়ার যুদ্ধে আহ্বান করা) চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লিখেন,

" ডুই বার বার দাবি করে যে, তার দল ছাড়া যারা মসীহ (আ.)-কে খোদা রূপে এবং তাকে নবী রূপে মান্য করে, সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ ও আমেরিকার সকল খৃষ্টানদের উচিত ডুইকে অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা যাতে তারা ধ্বংস না হয়। আর যেহেতু তারা এই অযৌক্তিক বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে যে, সে খোদার রসুল। আর আমরা মুসলমানরা ডুইয়ের নিকট বিনীতভাবে জানাতে চাই যে, এই উদ্দেশ্যে কোটি কোটি মুসলমানকে হত্যা করার প্রয়োজন কি? আমাদের খোদা সত্য নাকি ডুইয়ের খোদা সত্য তা একটি সহজ পদ্ধতিতে নিরুপণ করা যেতে পারে। সেই পদ্ধতিটি হল, ডুই সাহেব যেন বারংবার মুসলমানদের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী না শোনায় বরং তিনি সমস্ত মুসলমানদের পরিবর্তে কেবল আমাকে সামনে রেখে এই দোয়া করে যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথমে মৃত্যু বরণ করে। ডুই যেহেতু ঈসা মসীহ (আ.)-কে খোদা হিসেবে মান্য করে, কিন্তু আমি তাঁকে একজন অনুগ্র মানুষ ও নবী

রূপে মান্য করি।.....যদি ডুই নিজের দাবীতে সত্যবাদী হয় এবং ঈসা মসীহ সত্যি সত্যিই খোদা হয়ে থাকেন তবে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতেই ফয়সালা হয়ে যাবে। সমস্ত দেশের মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার প্রয়োজন কি? সে যদি আমার এই বিজ্ঞাপ্তির উত্তর না দিয়ে অসংযমীতাপূর্বক দোয়া করতে থাকে এবং আমার মৃত্যুর পূর্বেই সে মারা যায় তবে তা আমেরিকার জন্য একটি নিদর্শন হবে। কিন্তু শর্ত হল কারোর মৃত্যু যেন মানুষের হাতে না হয় বরং কোন অসুস্থতার কারণে বা সর্পদংশনে বা বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে বা কোন জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু হয়।"

(রিভিউ অব রিলিজিয়নস, সেপ্টেম্বর, ১৯০২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মোবাহিলার এই চ্যালেঞ্জকে আমেরিকার একাধিক প্রসিদ্ধ পত্রিকা যথাযথভাবে প্রকাশ করে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন সেই সত্য প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরে। গাউন্ট সান ফ্রান্সিসকো পত্রিকা ১৯০২ সালের, ১লা ডিসম্বরের সংখ্যায় 'ইংরেজি ও আরবী-র দোয়া মোকাবেলা' (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম বনাম ইসলাম ধর্ম) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে যাতে লেখা হয়, " ডুইকে লেখা মির্যা সাহেবের প্রবন্ধের সারাংশ হল, তুমি একজন জামাতের নেতা। অনুরূপে আমারও অনেক অনুগামী আছে। অতএব আমাদের মধ্যে কে খোদার পক্ষ থেকে এই বিষয়টির সমাধানের জন্য জরুরী হল আমাদের উভয়ের খোদার নিকট দোয়া করা। যার দোয়া গৃহীত হবে সে খোদার পক্ষ থেকে বলে গণ্য হবে। এই মর্মে দোয়া করা হবে যে, আমাদের দুই জনের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী খোদা তা'লা তাকে যেন প্রথমে মৃত্যু দেয়। অবশ্যই এটি একটি যুক্তিপূর্ণ এবং ন্যায় সাপেক্ষ প্রস্তাব।"

(পরিশিষ্ট হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা-৭১)

এই মোবাহালার চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে ডুই-এর পক্ষ থেকে কোন উত্তর না আসার ফলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অনবরত তাকে পত্র ও ইশতেহারের মাধ্যমে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, সে যেন মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। তিনি (আ.) ইশতেহারের অনুলিপি আমেরিকার পত্রিকাবলীর নিকটও পাঠাতে থাকেন। এই সকল ইশতেহার ১৯০৩ সালে আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় ব্যপককহারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সেই চ্যালেঞ্জসহ প্রকাশ পায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক হাকীকাতুল ওহী-তে ৩২ টি পত্রিকার সারাংশ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ডুইকে বার বার মোবাহিলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আহ্বান করা সত্বেও সে কোন উত্তর দেয় নি। সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের পত্রিকায় সে লেখে-

" ভারতে একজন নির্বোধ মহম্মদী মসীহ আছে যে আমাকে বারা বার লিখে জানায় যে, ঈসা মসীহর কবর কাশ্মীরে আছে। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কেন এই ব্যক্তির উত্তর দিই না? তোমরা কি মনে কর আমি ঐ সমস্ত মশা-মাছির উত্তর দিব? আমি যদি এদের উপর নিজের পা রাখি তবে তাদেরকে পিষ্ট করে ফেলব। "

(পরিশিষ্ট হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ৭৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন এমন দুঃসাহসের কথা জানতে পারলেন, তিনি (আ.) খোদা তা'লার আদালতে এই মোকাদ্দমার কৃতকার্যতার জন্য বিনয়ী দোয়ার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই সময়েই ডক্টর ডুই আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ায় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছিল। নিজের সাস্থ্য, শক্তি এবং সম্মান নিয়ে সে অত্যন্ত গর্বিত ছিল। সে তার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তার খ্যাতি দূর-দূরান্তে পৌঁছে যাওয়ার সে অহংকারে আত্মহারা হয়ে উঠছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ২৩ শে আগস্ট, ১৯০৩ সালের একটি ইশতেহারে লেখেন-

" এখনও পর্যন্ত ডুই সাহেব আমার মোবাহেলার আবেদনের কোন উত্তর দেয় নি। নিজের পত্রিকাতেও এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেয় নি। অতএব আজ ২৩ শে আগস্ট, ১৯০৩ তারিখে আমি তাকে আরও ৭ মাসের সময় সীমা দিলাম। এই সময়সীমার মধ্যে সে যদি আমার মোকাবিলায় উপস্থিত হয়, যে পদ্ধতিতে আমি মোবাহেলার প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং যেটি আমি প্রকাশ করেছিলাম, সেই প্রস্তাবটিকে যদি সে পূর্ণতভাবে স্বীকার করে নিজের পত্রিকায় প্রকাশ্য ইশতেহার হিসেবে প্রকাশ করে, তবে খুব শীঘ্রই বিশ্ববাসী দেখবে যে, এর পরিণাম কি দাঁড়ায়। যদি ডুই এই মোকাবেলা থেকে পলায়ন করে, তবে আজ আমি আমেরিকা ও ইউরোপের বাসিন্দাদেরকে এ বিষয়ের সাক্ষী রাখলাম যে, এমনটি করা তার পরাজয় বলে বিবেচিত হবে। অতএব, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো! তার শহর সাহিউনের উপর অচিরেই দুর্যোগ নেমে আসতে চলেছে। কেননা, এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যে অবশ্যই সে একটির কবলে পড়বে। "

(রিভিউ অব রিলিজিয়নস, এপ্রিল- ১৯০৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ইশতেহারটির সম্পর্কেও আমেরিকার পত্রিকাসমূহে অনেক আলোচনা হয়। এই ইশতেহারের ফলে ডুই কার্যত রণে ভঙ্গ দেয়। ১৯০৩ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখে নিজের পত্রিকায় সে লেখে,

" ভারতে একজন নির্বোধ ব্যক্তি যে কিনা মহম্মদী মসীহ হওয়ার দাবী করে এবং আমাকে বার বার বলে যে, হযরত ঈসা মসীহ কাশ্মীরে সমাহিত আছেন এবং তাঁর কবর দেখা যেতে পারে। সে একথা বলে না যে, সে নিজেই সেই কবর দেখেছে। কিন্তু এই উন্মাদ ও অজ্ঞ ব্যক্তি তবুও সে একই মিথ্যারোপ করে চলে যে, হযরত মসীহ ভারতে মৃত্যু বরণ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হল খোদা বন্দ মসীহ গিয়াহ নামক স্থান থেকে আকাশে আরোহন করেছেন যেখানে তিনি অপার্থিব শরীরে বিদ্যমান।"

অতঃপর ১৯০৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারী মুসলমানদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী পুণরাবৃত্তি করে সে লেখে,

" লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা কিনা বর্তমানে একজন মিথ্যা নবীর অধীনে রয়েছে, হয় তাদেরকে খোদার ডাকে সাড়া দিতে হবে না হয় ধ্বংস হতে হবে।"

(তারিখ আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬)

ডুই যেহেতু একজন বস্তুবাদী এবং আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি ছিল, সে লোকেদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে সাহিউন শহর গড়ে তুলেছিল। তার আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য ধীরে ধীরে তার সম্ভ্রম হ্রাস পেতে থাকে এবং তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দেয়। আর্থিক সংকট দূর করার জন্য সে অন্যত্র একটি শহর গড়ে তুলতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু খোদার ঐশী লিখন তাকে এ কাজে সফলতা থেকে বঞ্চিত করে। কেননা, সে যুগ পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এখন সমগ্র বিশ্বে বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য ইসলামের পরম উৎকর্ষের পর এর সত্যতা প্রকাশের সময় এসে পড়েছিল। ১৯০৫ সালের ১লা অক্টোবর তার পক্ষাঘাত হয়। সে বছরই ১৯ শে ডিসেম্বর পূণরায় পক্ষাঘাত হয়। সে তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার যাবতীয় খ্যাতির অবসান হয়। সাহিউন শহরবাসীরা নিজেদের নতুন নেতা নির্বাচিত করে ফেলে। ডুই অসুস্থতার কারণে ক্রমশঃ অবসন্নতায় ঢলে পড়তে থাকে। তার শুশ্রুষার জন্য একজন বেতনধারী কৃষ্ণাঙ্গ নিয়োজিত হয়। সে তাকে এক স্থান থেকে অন্যত্র উঠিয়ে নিয় যেত। কোন কোন সময় ডুই তার হাত থেকে এমন ভাবে মাটিতে পড়ে যেত যেভাবে নির্জীব পাথর পড়ে যায়। অবশেষে যুগ পুরুষ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৯ ই মার্চ ১৯০৭ সালে ইহধাম ত্যাগ করে। তার স্ত্রী-সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন শেষকৃত্যে অংশ গ্রহণ করেনি। হযরত

মসীহ মওউদ (আ.) ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ , তার মৃত্যুর পূর্বেই একটি ইশতেহারের মাধ্যমে এই নিদর্শনটি পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে লোকদের বলে দিয়েছিলেন।

এখন লক্ষ্য করুন যে খোদা কীভাবে তাঁর প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে পৌছানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। যদি ইউরোপ ও আমেরিকায় হাজার হাজার মানুষকে নিয়োজিত করা হত তবে এমনভাবে তবলীগ পৌঁছাত না যেভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শনের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকায় আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। এইভাবে ইসলাম আহমদীয়াতের মহান বিজয়ের নিদর্শন প্রকাশ পেল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

" এখন এটি একটি স্পষ্ট বিষয় যে, এমন নিদর্শন (যা কিনা মহান বিজয়ের কারণ হবে) যা সমগ্র বিশ্বে, এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ এবং ভারতে একটি প্রকাশ্য নিদর্শন হতে পারে সেটি হল ডুইয়ের ধ্বংসের নিদর্শন। কেননা, আরও অন্যান্য নিদর্শন যা আমার ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি কেবল পাঞ্জাব এবং ভারত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আমেরিকা ও ইউরোপের কোন কোন ব্যক্তির কাছে তার আবির্ভাবের সংবাদ ছিল না, কিন্তু এই নিদর্শনটি পাঞ্জাব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে প্রকাশ পাওয়ার পর আমেরিকায় গিয়ে এমন এক ব্যক্তির হাতে পূর্ণতা লাভ করছে যাকে আমেরিকা ও ইউরোপের প্রত্যেক মানুষ চিনত। "

(তারিখ আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৫০)

ডুইয়ের মৃত্যু একদিকে যেমন ক্রশ খণ্ডনের নিদর্শন পূর্ণ হল অপরদিকে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের দ্বিতীয় পুণর্জাগরণে ভিত্তি রচিত হল এবং সৎ প্রবৃত্তির মানুষদের মনে আল্লাহ ত'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করলেন। ডুইয়ের মৃত্যুর পর ইউরোপ আমেরিকার প্রচার মাধ্যমে তুমুল আলোচনা শুরু হয়। যেমন, আমেরিকান পত্রিকা ট্রুথ স্ক্যায়ার ১৯০৭ সালের ১৫ ই জুনের সংখ্যায় " নবীদের যুদ্ধ" নামক শিরোনামে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় কলম প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ উল্লেখ করা হয়। অনুরূপভাবে বোস্টন হেরাল্ড নামে একটি পত্রিকা ১৯০৭ সালে ২৩ শে জুন তাদের রবিবারের সংস্করণে একটি পূর্ণ পৃষ্ঠায় এই ভবিষদ্বাণীর পূর্ণ হওয়া এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর একটি বড় আকারের ছবি প্রকাশ করে এবং নিম্নোক্ত শিরোনামের সাতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে;

" মির্যা গোলাম আহমদ আল মসীহ একজন মহান ব্যক্তি"

যদিও এই নিদর্শন প্রকাশের পূর্বেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদানের মাধ্যমে মিস্টা ওয়েব মুসলমান হয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমে মিস্টার এন্ডারস হযরত মুফতী মহম্মদ সাদেক (রা.)-এর কাছে পত্রালাপের মাধ্যমে ১৯০৪ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর এই নিদর্শনের পর আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলামের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম আহমদীয়াতের তবলীগের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) হযররত চৌধুরী ফতেহ মহম্মদ সিয়ালকোটী (রা.) কে ২৮ শে জুন ১৯১২ সালে খৃষ্টবাদের কেন্দ্রভুমি ইংল্যান্ডে পাঠান। এবং পরবর্তী ঘটনাক্রম প্রমাণ করে যে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং পশ্চিমাদেশগুলিতে ইসলামের পুণর্জাগরণ, উন্নতি ও বিজয়ের জন্য ব্রিটেনই কেন্দ্র রূপে গণ্য হল। অর্থাৎ এই নিদর্শনের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় একটি সংগঠিত পদ্ধতিতে ইসলামের পুণর্জাগরণের আন্দোলনের সূচনা হয়। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ আস সানী (রা.) হযরত মুফতী মহম্মদ সাদেক (রা.)-কে ২৬ শে জানুয়ারী ১৯২০ সালে আমেরিকা রওনা করেন। তাঁকে সেই দেশে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় এবং নজরবন্দী করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এবিষয়ে অবগত হলে বললেন,

" আমেরিকা যে কিনা শক্তিধর হওয়ার দাবী করে, এখনও পর্যন্ত তারা পার্থিব সাম্রাজ্যের মোকাবিলা করেছে এবং তাদেরকে হয়তো পরাজিতও করেছে। তারা আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের এখনও পর্যন্ত মোকাবেলা করে দেখে নি। এরা যদি আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে আসে তবে জানতে পারবে যে, তারা আমাদেরকে কখনোই পরাজিত করতে পারবে না। কেননা খোদা তা'লা আমাদের সঙে আছেন। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আশেপাশের এলাকায় তবলীগ করে সেখানকার মুসলমানদেরকে আমেরিকায় পাঠাব, তাদেরকে আমেরিকা বাধা দিতে পারবে না। আমি আশা রাখি যে, আমেরিকায় একদিন অবশ্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' ধ্বনি মুখরিত হবে। ইনশাল্লাহ॥ " (আল-ফযল, ১৫ ই এপ্রিল, ১৯২০)

১৯২৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাঁর প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় ১৯ শে অক্টোবর তারিখে মসজিদে ফযল লন্ডনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এইভাবেই ইউরোপীয় দেশসমূহে এবং খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি ইংল্যান্ডে একত্ববাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। এর মাধ্যমেই একত্ববাদের ধ্বনি মুখরিত হতে থাকে। অতঃপর ১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ)-এর হিজরতের পর এই মসজিদটিই ইউরোপীয় দেশসমূহে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এখানে খলীফার উপস্থিতি এবং বিভিন্ন ভ্রমণের ফলে আল্লাহ্‌র কৃপায় আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলামের বিজয় অভিযান আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এই বিজয় তোপ, বন্দুক বা তরবারীর মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে না বরং যুক্তি-প্রমাণ এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার কল্যাণে অর্জিত হচ্ছে। এই সকল দেশগুলির নেতা, রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর কাছে আজ আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম মানবতার সেবা এবং সকলের তরে ভালবাসা কারো তরে ঘৃণা নহে, এই বাণীর কারণে পরিচিত। বর্তমানে এই সকল নেতা এবং বুদ্ধিজীবিরা বুঝতে পারছে যে, প্রকৃতই ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম নয়। শুধু তাই নয়, ইসলাম আহমদীয়াতের অনিন্দ্য সুন্দর ও আকর্ষনীয় শিক্ষার কারণে এই সকল দেশের নেতারা আজ জামাত আহমদীয়ার ইমামের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে নিজেদের পার্লামেন্টে ভাষণ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ইসলামকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য একদিন ডুই আস্ফালন করছিল আর আজ ঠিক এর বিপরীত ইউরোপীয় দেশসমূহের পার্লামেন্টে ইসলামের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। আজকে ইসলাম আহমদীয়াতের উন্নতি এবং জয়যাত্রা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

আমেরিকায় নবীর মিথ্যা দাবীদার ডক্টর জন আলেকজান্ডার ডুই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মারা গেল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা হাকীকাতুল ওহীতে উপরোক্ত শিরোনামে লেখেন-

" (নিদর্শন নং ১৯৬) স্পষ্ট থাকে যে, এই ব্যক্তি ইসলামে ঘোর শত্রু যার নাম উপরোক্ত শিরোনামে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া সে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার এবং নবীকুলের শিরোমনি হযরত

মহম্মদ (সা.)-কে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা রচনাকারী বলে ধারণা করত। সে নিজের নোঙরা প্রবৃত্তির কারণে তাঁকে গালি দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে অপলাপ করত। মোট কথা ইসলামের প্রতি তীব্র বিদ্বেষের কারণে তার মধ্যে অনেক কলুষতা বিদ্যমান ছিল। যেরূপ প্রবাদ আছে, শুয়রে রতন চেনে না, অনুরূপে সে ইসলামের একত্ববাদকে অত্যন্ত তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখত এবং ইসলামে সমূলে উৎপাটন করার বাসনা রাখত। সে হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা জ্ঞান করত এবং সমগ্র বিশ্বে ত্রিত্ববাদের প্রসার করার জন্য এত বেশি উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল যে, এমনটি অন্যত্র কোথাও দেখিনি, যদিও আমি পাদরীদের শত শত পুস্তক পাঠ করেছি। ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯০৩ এবং ১৪ ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ -এর সংখ্যায় সে তার পত্রিকা লাইভস অব্ হিলিং-এ লেখে-

" আমি খোদার কাছে দোয়া করি যে, সেই দিন যেন শীঘ্রই উপস্থিত হয় যেদিন ইসলাম পৃথিবী থেকে সমূলে উৎপাটিত হবে। হে খোদা তুমি এমনটি কর। হে খোদা! তুমি ইসলামকে ধ্বংস করে দাও।" এরপর ১২ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সনের সংখ্যায় নিজেকে সত্য রসূল ও সত্য নবী আখ্যায়িত করে দাবী করে যে, " যদি আমি সত্য নবী না হই তবে ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে খোদার নবী হতে পারে।" এছাড়াও সে ঘোর মুশরিক। সে বলত, আমার উপর ইলহাম হয়েছে যে, পঁচিশ বছরের মধ্যে ঈসা মসীহ আকাশ থেকে নেমে আসবে। সে হযরত ঈসাকে প্রকৃত খোদা জ্ঞান করত। এছাড়াও আরও একটি বেদনাদায়ক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সে আমাদের নবী (সা.)-এর ঘোর শত্রু ছিল। আমি তার পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম, সেই কারণে আমি তার দুর্মুখতা সম্পর্কে অবগত হতাম। যখন তার অহংকার সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমি তার নামে ইংরেজি ভাষায় একটি চিঠি পাঠাই এবং মোবাহেলার জন্য তাকে অনুরোধ জানাই যেন খোদা তা'লা আমদের মধ্যে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যু দান করেন। এই আবেদন দুই বার তাকে পাঠানো হয়। অর্থাৎ একবার ১৯০২ সালে এবং একবার ১৯০৩ সালে। এই আবেদন আমেরিকার কয়েকটি খ্যাতনামা পত্রিকাতেও প্রকাশ করা হয়েছিল।

মোবাহেলা বিষয়ক এই প্রবন্ধে আমি মিথ্যাবাদীর জন্য বদ দোয়া করেছিলাম এবং খোদা তা'লার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, হে খোদা! মিথ্যাবাদীর মিথ্যা প্রকাশ করে দাও। যেরূপ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, মোবাহেলার এই প্রবন্ধটি কয়েকটি খ্যাতনাম দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলি আমেরিকার খ্রীষ্টানদের ছিল যাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই প্রবন্ধটি পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করা এই জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল যে, নবীর মিথ্যাদাবীদার ডক্টর ডুই আমাকে সরাসরি কোন উত্তর দেয় নি। অবশেষে এই প্রবন্ধটি আমেরিকার খ্যাতনামা দৈনিকে ব্যাপকহারে প্রকাশ করা হল। এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, যদিও আমেরিকার এই পত্রিকাগুলির সম্পাদক খৃষ্টান ছিল এবং ইসলামের বিরোধী ছিল তা সত্বেও তারা এমন আড়ম্বরসহকারে আমার মোবাহেলার এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করল যে, আমেরিকা ও ইউরোপে তুমুল আলোড়ন শুরু হল, এমনটি ভারতে পর্যন্ত এই মোবাহেলার সংবাদ পৌঁছে গেল। আমার এই প্রবন্ধের সারংশ ছিল যে, ইসলাম সত্য এবং খৃষ্টধর্মের মতবাদ মিথ্যা। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সেই মসীহ যার আবির্ভাব শেষ যুগে নির্ধারিত ছিল, ধর্মগ্রন্থসমূহে যার প্রতিশ্রুতি ছিল। আমি এও লিখেছিলাম যে, ডক্টর ডুই নিজের রসূল হওয়ার দাবীতে এবং ত্রিত্ববাদের আকিদায় মিথ্যাবাদী। যদি সে আমার সাথে মোবাহেলা করে তবে আমার জীবদ্দশাতেই সে অত্যন্ত পীড়াসহ কারে অপূর্ণ বাসনা নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি সে মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ স্বীকার নাও করে তবু সে খোদার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এর উত্তরে হতভাগা ডুই ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে একটি পত্রিকায় এবং ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯০৩ সালের পত্রিকায় নিজের পক্ষ থেকে কয়েকটি লাইন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে যার অনুবাদ নিম্নরূপ-

ভারতে একজন নির্বোধ মহম্মদী মসীহ এসেছে যে আমাকে বার বার লিখছে যে, ঈসা মসীহর কবর কশ্মীরে আছে। লোকে আমাকে বলে তুমি এর উত্তর কেন দাও না। তুমি কেন এই ব্যক্তির উত্তর দাও না? তোমাদের কি ধারণা আমি ঐ সকল মশা-মাছির উত্তর দিব, যাদেরকে আমি পায়ে করে পিষ্ট করে মেরে ফেলতি পারি?"

এই পত্রিকায় ১৯শে ডিসেম্বর ১৯০২ সালে লেখে- " আমার কাজ হল পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের মানুষকে একত্রিত করা এবং খৃষ্টানদেরকে এই শহর ও অন্যান্য শহরে আবাদ করা যতদিন পর্যন্ত না সেই দিন উপস্থিত হয় যে দিন মহম্মদী ধর্ম পৃথিবী থেকে উৎপাটিত হবে। হে খোদা! আমাদেরকে সেই সময় দেখাও।"

মোটকথা এই ব্যক্তি আমেরিকা , ইউরোপ এবং সমগ্র বিশ্বে আমার মোবাহেলার প্রবন্ধের প্রচারের পর নিজের আস্ফালন ও আত্মাম্ভিরতায় দিন দিন আরও বেশি অধঃপতিত হতে থাকল। এদিকে আমি এই প্রতীক্ষায় ছিলাম যে, যা কিছু আমি তার এবং নিজের সম্পর্কে খোদা তা'লার কাছে সিদ্ধান্ত চেয়েছিলাম খোদা তা'লা অবশ্যই সেই সত্য সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করবে।

এবং আমি সর্বদা খোদা তা'লার কাছে এই দোয়া করতাম এবং মিথ্যাবাদীর জন্য মৃত্যু চাইতাম। খোদা তা'লা কয়েকবার আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তুমি জয়ী হবে এবং শত্রু ধ্বংস হবে। এরপর ডুইয়ের মৃত্যুর প্রায় ১৫ দিন পূর্বে খোদা তা'লা তার বাণীর মাধ্যমে আমাকে বিজয় সংবাদ প্রদান করেন যা আমি 'কাদিয়ান কে আরইয়া অওর হাম' নামক পুস্তিকাটির মূখ্য পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অংশে ডুইয়ের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশ করেছিলাম। সেই অংশটুকু নিম্নরূপ।

তাজা নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী

খোদা তা'লা বলেন যে, আমি একটি তাজা নিদর্শন প্রকাশ করব যার মধ্যে মহান বিজয় নিহিত থাকবে। এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন হবে। (অর্থাৎ এর প্রকাশ পাওয়া কেবল ভারত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না) এই নিদর্শন খোদা তা'লার হাতে এবং উর্দ্ধলোক থেকে প্রকাশ পাবে। প্রত্যেক দৃষ্টি যেন তারই প্রতীক্ষায় থাকে। কেননা, খোদা তা'লা অচিরেই তা প্রকাশ করবেন, যাতে সে সাক্ষী দেয় যে, এই অধম যাকে সমগ্র জাতি গালি দিচ্ছে সে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে। ধন্য সেই যে এর থেকে লাভবান হয়।"

মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ মওউদ

প্রকাশনা ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ খৃঃ (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং আরবদের মধ্যে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের প্রচার

মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পশ্চাৎবর্তীদের সঙ্গে অগ্রবর্তীদের সমন্বয় সাধনকারী প্রতিশ্রুত নবী পারস্য বংশে আবির্ভুত হলেন। তিনি হলেন আঁ হযরত (সা.)-এর আধ্যাত্মিক পুত্র এবং প্রতিচ্ছবি যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ প্রতিশ্রুতি পুর্ণ করা নির্ধারিত রেখেছিলেন। এই মহান কার্য সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যেখানে তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে একথা বলেছেন যে, আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীরে প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব, তেমনি অপরদিকে তিনি বিভিন্ন জাতি ও দেশে তাঁর তবলীগ ও প্রচারকে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে পৌঁছে দেওয়ার শুভসংবাদও দিয়ে রেখেছেন। হযরত মসীহ মওউদ যে আরব নবীর (সা.) সেবক, প্রেমিক এবং আধ্যাত্মিক পুত্র হিসেবে আবির্ভুত হয়েছিলেন সেই আরব জাতি ও দেশ সম্পর্কে তাকে সংবাদ না দেওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমেও আরবদের সম্পর্কে অবগত করেন।

আরবদের মধ্যে তবলীগ পৌঁছানো এবং তাদের ঈমান আনয়নের শুভসংবাদ

একটি দিব্যদর্শনের উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "২৫/২৬ বছর পূর্বে আমি একটি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, একজন ব্যক্তি আমার নাম লিখছে। অর্ধেক নাম আরবীতে লিখেছে এবং বাকী অর্ধেক ইংরেজিতে লিখেছে।"

(আল-হাকাম, ৯ম খন্ড)

১৯০৫ সালে হুযুর (আ.) বলেন, ২৫/২৬ বছর পূর্বের এই দিব্যদর্শন দেখেছি, অর্থাৎ এটি ১৮৮০ সালের ঘটনা।

এই দিব্যদর্শনের মাধ্যমে আরব ও অনারবদের মধ্যে তাঁর (আ.) সমান গ্রহণীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। হুযুর (আ.)-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যও এই স্বপ্নের ব্যখ্যা যেখানে তিনি বলেন- "এক্ষণে আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। একটি হল আরবদের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের কাজ এবং ইউরোপের মধ্যে 'হুজ্জাত' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা) পূর্ণ করা। আরবদের মধ্যে প্রচারের কারণ হল আভ্যন্তরীনভাবে তারা সত্য পথে রয়েছে। আরবদের একটি বিরাট অংশ হয়তো এটুকুও জানে না যে, খোদা তা'লা কোন সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য। যদি না পৌঁছাই তবে অপরাধ হবে। অনুরূপভাবে ইউরোপবাসী একজন মানুষকে খোদার মর্যাদা দিয়ে যেভাবে খোদা থেকে দূরে সরে পড়েছে , তাদের এই ভ্রান্তি প্রকাশ করাও কর্তব্য।"

(মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৫৩)

১৮৯৩ সালে হুযুর (আ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ হামামাতুল বুশরায় বলেন,

অনুবাদ: আমার প্রভু প্রতিপালক আরবদের সম্পর্কে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে ইলহাম করেছেন যে, আমি যেন তাদের কুশলসংবাদ নিই এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিই এবং তাদের সমস্যাবলীর সমাধান করি।

(হামামাতুল বুশরা, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২)

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সালে হুযুর (আ.)-কে একটি কাশফে একটি কাগজের টুকরো দেখানো হয় যাতে লেখা ছিল, "مَصَالِحُ الْعَرَبِ مَسِيْرُ الْعَرَبِ"

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: এর অর্থ এটিও হতে পারে যে, আমার আরবে যাওয়া নির্ধারিত আছে.....(এর আরেকটি অর্থ) আম্বিয়াদের সঙ্গে হিজরতও হতে পারে, কিন্তু কিছু স্বপ্ন নবীর নিজের সময়কালে পূর্ণ হয়ে থাকে এবং কিছু স্বপ্ন তার সন্তান অথবা কোন অনুসারীর মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আঁ হযরত (সা.) ক্যায়েসার ও কিসরার চাবি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর সেই দেশ দুটি হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে জয় হয়।" (বদর, ১ম খন্ড, ২৩ নম্বর, ৭সেপ্টেম্বর, ১৯০৫)

অনুরূপভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল সানী (রা.)-এর যুগে পূর্ণতা লাভ করে। হুযুর (রা.) দুবার আরব ভ্রমণ করেন। প্রথম ভ্রমণ করেন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ১৯১২ সালে। সে সময় তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদিনা যাত্রা করেন এবং দ্বিতীয় বার তিনি (রা.) ১৯২৪ সালে বায়তুল মুকাদ্দস ও দমাস্ক যাত্রা করেন।

"مَصَالِحُ الْعَرَبِ" এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের যুগে আরবদের মধ্যে আহমদীয়াতের প্রচার এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের পথ-প্রদর্শন এবং তাদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে।

মক্কাবাসীর দলে দলে আহমদীয়াত গ্রহণ করার শুভসংবাদ

১৮৯৪ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচিত আরবি পুস্তকে এই শুভসংবাদ লিখেন:

وَإِنِّيْ أَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَدْخُلُوْنَ أَفْوَاجًا فِيْ حِزْبِ اللهِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ، هٰذَا مِنْ رَبِّ السَّمَآءِ وَعَجِيْبٌ فِيْ أَعْيُنِ أَهْلِ الْأَرْضِيْنَ-

আমি দেখছি যে, মক্কাবাসী মহাশক্তিশালী খোদার জামাতে দলে দলে প্রবেশ করবে। আর এটি আসমানের খোদার পক্ষ থেকে সংঘটিত হবে, পৃথিবীাবাসীর দৃষ্টিতে এটি অদ্ভুত (মনে হবে)।

(নুরুল হক, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৭)

সিরিয়া ও আরবের অন্যান্য শহর থেকে মোমেনীন-এর জামাতের সুসংবাদ

হুযুর (আ.) তাঁর রচনা 'হুজ্জাতুন নূর'- বলে বলেন, (আরবী থেকে অনুদিত)

আমি সুসংবাদ জনক একটি স্বপ্নে নিষ্ঠাবান মোমিনীন এবং ন্যায়পরায়ণ ও পুণ্যবান বাদশাহদের একটি জামাত দেখে যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এই দেশের (ভারতের) ছিল এবং কিছু মানুষ আরবের, কিছু পারস্যের এবং কিছু মানুষ রোমের ছিল যাদেরকে আমি চিনি না। অতঃপর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে বলা হল যে, এই সকল লোকেরা তোমার সত্যায়ন করবে , তোমার উপর ঈমান আনবে, তোমার উপর দরুদ প্রেরণ করবে এবং তোমার জন্য দোয়া করবে। আর আমি তোমাকে অনেক বরকত প্রদান করব, এমনকি বাদশাহ তোমার বস্ত্র থেকে বরকত অন্বেষণ করবে। আমি তাদেরকে নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত করব। এই স্বপ্নটি আমি দেখি এবং সেই ইলহামটি যা সর্বজ্ঞানী খোদার পক্ষ থেকে আমাকে করা হয়েছে।

(হুজ্জাতুন নূর, রূহানী খাযায়েন, ১৬তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৯-৩৪০)

পুণ্যবান আরব ও সিরিয়ার আব্দালদের সুসংবাদ

১৮৮৫ সালের ৬ এপ্রিল তিনি (আ.) একটি স্বপ্ন দেখেন। সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

"আজ এখনই স্বপ্নে দেখি যে, আমি একটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। আমি ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে

রাজেউন' উচ্চারণ করলাম। যে ব্যক্তি সরকারি ভাবে আমাকে ধরপাকড় করে আমি তাকে বললাম যে, তুমি কি আমাকে কয়েদ করবে? সে এভাবে বলল যে, নীচে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি বললাম আমি আমার মহামহিমান্বিত খোদার অধীনে রয়েছি, তিনি আমাকে যেখানে বসাবেন আমি সেখানেই বসব, যেখানে দাঁড় করাবেন সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ব। অতঃপর আমার এই ইলহামটি অবতীর্ণ হল:

يَدْعُونَ لَكَ أَبْدَالُ الشَّامِ
وَعِبَادُ اللهِ مِنَ الْعَرَب

অর্থাৎ তোমার জন্য সিরিয়ার আবদালরা এবং আরবদের মধ্যে খোদার বান্দারা দোয়া করছে। আমি জানি না যে, এটি কিসের বিষয়ে, এবং কবে ও কীভাবে প্রকাশ পাবে।

(মাকতুব, ৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৬)

*আগস্ট, ১৮৮৮ সালে তিনি বলেন:

" মহামহিমান্বিত খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে,

يُصَلُّونَ عَلَيْكَ صُلَحَاءُ الْعَرَبِ
وَأَبْدَالُ الشَّامِ. وَتُصَلِّي عَلَيْكَ الأَرْضُ
وَالسَّمَاءُ. وَيَحْمَدُكَ اللهُ مِنْ عَرْشِه

(মাকতুব হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) আগস্ট, ১৮৮৮)

উপরোক্ত আরবী ইলহামের অর্থ হল, আরবদের মধ্যে পুণ্যবাণ ব্যক্তিগণ এবং সিরিয়ার আবদাল তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। আকাশ ও পৃথিবী তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং আরশ থেকে আল্লাহ তা'লা তোমার প্রশংসা করবে।

আরব-বিশ্বের প্রথম আহমদী

যেরূপ এই সকল ইলহাম ও সত্য স্বপ্ন ও কাশফ থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ১৮৮০ সাল থেকেই আরবদের সম্পর্কে সুসংবাদ, তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, তাদের সঠিক পথের দিশা দেওয়া এবং তাদের মধ্যে আহমদীয়াত প্রবেশ করা সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া শুরু হয়। তাসত্বেও হুযুর (আ.) ১৮৯১ সাল পর্যন্ত না কোন আরবী পুস্তক রচনা করেছিলেন, আর না আরবদের মধ্যে তবলীগের কোন পথ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেই খোদা যিনি সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন তিনি স্বয়ং সেগুলি পূর্ণ করার জন্য উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দেশের একজন পুণ্যবান ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চরণে এনে উপস্থিত করলেন। এইভাবেই আরবে আহমদীয়াতের প্রথম চারাবৃক্ষ রোপিত হল। তাঁর নাম হল হযরত শেখ মহম্মদ বিন আহমদ আল মক্কী সাহেব (রা.)। তিনি ১০ জুলাই ১৮৯১ সালে বয়াত করেন। জামাতের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং বয়াত সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন-

" আমার প্রিয়ভাজন মহম্মদ বিন আহমদ মক্কী । মহাশয় আরব দেশের অধিবাসী এবং মক্কারই বাসিন্দা। যোগ্যতা, পুণ্য এবং সৎকর্মশীল হওয়ার লক্ষণ তাঁর চেহারায় ফুটে ওঠে। নিজের জন্মস্থান পবিত্র মক্কাভুমি থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এই দেশে আগমণ করলে সেই সময় কিছু দুরাচারী লোক অসত্য তথ্য বরং আমার সম্পর্কে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু অপবাদ রচনা করে তাঁকে শোনায় এবং বলে যে, এই ব্যক্তি নবুয়াতের দাবী করছে। আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীমের অস্বীকারকারী এবং বলে যে, যে মসীহর উপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে, আমিই সেই মসীহ। এই সকল কথা শুনে এই আরব ব্যক্তির মনে ইসলামের প্রতি আত্মাভিমান বশতঃ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তিনি তখন আরবী ভাষায় আমার নিকট পত্র লেখেন যাতে এই বাক্যগুলিও লিপিবদ্ধ ছিল।

إن كنت عيسى
ابن مريم فأنزل علينا مائدة أيها
الكذاب. إن كنت عيسى ابن مريم
فأنزل علينا مائدة أيها الدجال

অর্থাৎ যদি তুমি ঈসা ইবনে মরিয়ম হও তবে হে কাযযাব, হে দাজ্জাল! আমাদের উপর মায়েদা অবতীর্ণ কর। কিন্তু জানি না এটি কোন সময়ের দোয়া ছিল যা কবুল হয়েছিল এবং যে মায়েদা প্রদান করে খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছিলেন, সেই মহাপরাক্রমশালী খোদা তাকে সেই দিকে টেনে এনেছে। তিনি লুধিয়ানায় এসে এই অধমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সিলসিলার বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন।

তিনি বলেন, যখন আমি আপনার সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করতাম তখন আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে যে, হে মহম্মদ তুমিই কাযযাব (ভয়ানক মিথ্যাবাদী)। তিনি একথাও বলেন যে, তিন বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, ঈসা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে গেছেন এবং আমি আপন মনে একথা বলছিলাম যে, ইনশাল্লাহুল কাদির আমি নিজের জীবদ্দশাতে ঈসাকে দেখে নিব।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৩৮-৫৩৯)

এইভাবে হযরত মহম্মদ বিন আহমদ মাক্কী সাহেব (রা.) ১০ জুলাই, ১৮৯১ সালে প্রথম আরব হিসেবে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করা সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর বয়াত রেজিস্টার বয়অতে ১৪১ নম্বরে নথিভুক্ত আছে। যেখানে তাঁর পুরো নাম শেখ মহম্মদ বিন আহমদ মাক্কী মিন হারাতে শা'ব আমির

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৫)

বয়াতের পর কিছু সময় তিনি কাদিয়ানে অবস্থান করেন এবং ১৮৯২ সালের জলসা সালানাতেও অংশ গ্রহণ করেন। এটি জামাতের ইতিহাসের দ্বিতীয় জলসা ছিল। ৩২৭ জন সদস্য এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন যার মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। এই সকল সদস্যদের নামের তালিকা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা আয়নায়ে কামালাতে ইসলামের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিছু কাল যাবৎ বরকত থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার পর ১৮৯৩ সালে তিনি মক্কাভুমিকে ফিরে আসেন। সেখানে তিন হজ্জের কর্তব্য পালন করার পর ৪ঠা আগস্ট ১৮৯৩ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে একটি পত্র লেখেন যাতে তিনি কুশলে পবিত্র মক্কায় পৌঁছানোর সংবাদ দেন এবং হযরত আকদস (আ.)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে আরবী ভাষায় হুযুর (আ.)-এ দাবি সম্বলিত কিছু পুস্তক-পুস্তিকা পাঠানোর জন্য আবেদন জানান। এর উত্তরে হুযুর (আ.) হামামাতুল বুশরা রচনা করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঞ্জামের আথম-এর শেষে নিজের তিন শত তেরো জন সাহাবার নামের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে তাঁর নাম ৯৮ নম্বরে রয়েছে।

আরবদের পক্ষ থেকে অনুরোধ এবং তাদেরকে তবলীগের জন্য পুস্তক রচনা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, (নুরুল হক থেকে অনুদিত)

" যখন ভারত ভূমিতে এমন ভুমিকম্প এল যে, সারা ভূ-পৃষ্ঠ কেঁপে উঠল এবং উলেমাদের মধ্যে আমি কার্পণ্য ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করলাম তখন আমি মনস্থির করলাম যে, এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মক্কার দিকে পলায়ন করি এবং আরবদের মধ্যে পুণ্যবান ও মক্কার বুযুর্গদের প্রতি মনোনিবেশ করি।..... এমন প্রয়োজন দেখা দেওয়ার খোদা তা'লা সময় আমার মনে এই কথার সঞ্চার করেন যে, আমি যেন স্পষ্ট আরবী ভাষায় কয়েকটি পুস্তক রচনা করি।

সুতরাং আমি খোদার কৃপা ও দয়ায় এবং শক্তি-সামর্থ্য দানে একটি পুস্তক রচনা করলাম, যার নাম তবলীগ। এর দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করলাম যার নাম হল তোহ্‌ফা, এর পর তৃতীয় পুস্তক যার নাম হল কারামাতুস সাদেকীন, এর পর চতুর্থ পুস্তক যার নাম হল হামামাতুল বুশরা.....আমি এই সকল পুস্তক আরব ভূমির কেন্দ্রস্থলকে কেন্দ্র করে রচনা করেছি।

(নুরুল হক,প্রথম ভাগ, রূহানী খাযায়েন ৮ম খণ্ডের উর্দূ অনুবাদ)

হুযুর (আ.)-এর প্রথম আরবী পুস্তকঃ

* ১১ ই জানুয়ারী, ১৮৯৩ সালে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর অসাধারণ রচনা আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম-এর উর্দু অংশ রচনা সম্পূর্ণ করলেন তখন মৌলানা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকুটী (রা.) একটি মজলিসে হযরত আকদস (আ.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, এই পুস্তকটিতে মুসলমান ফকির এবং পীরযাদাদের জন্য 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সত্য প্রমাণ করে দেওয়া) পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে একটি পত্রও প্রকাশিত হওয়া উচিত, যারা দিবারাত্রি বেদাতে মগ্ন থাকে এবং খোদার প্রতিষ্ঠিত জামাত থেকে অনবহিত রয়েছে। প্রস্তাবটি হুযুর (আ.)-এর পছন্দ হল। তিনি (আ.) বলেন,

" আমার ইচ্ছা ছিল পত্রটি উর্দুতে লিখি, কিন্তু রাত্রিতে কিছু ইলহামী ইঙ্গিতে মনে হল যে, এই পত্রটি আরবীতে লেখা উচিত। এবং এও ইলহাম হয় যে, তাদের উপর এর প্রভাব নগণ্য হবে, তবে 'হুজ্জত' পূর্ণ হবে।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৯-৩৬০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় 'আত্ তাবলীগ' নামে একটি পত্র লিখলেন যার মাধ্যমে তিনি ভারত, আরব, মিশর, সিরিয়া, ইরান, তুরস্ক ও অন্যান্য দেশের সাজাদানশীন, যাহেদ এবং সুফীগণকে সত্যের বাণী পৌঁছে দিলেন।

আরবদের প্রতি অত্যন্ত প্রভাবশালী ভাষায় আহ্বান।

এই পুস্তকে হুযুর (আই.) আরবদেরকে সরাসরি সম্বোধন করেন। খোদা তা'লার ইলহাম ও পুরস্কাররাজি এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনে অলৌকিক আরবী ভাষায় রচিত এই পুস্তিকাটিতে আরবদের উদ্দেশ্যে বার্তা অতুলনীয় এবং প্রভাব বিস্তারকারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে ভাষায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরবদেরকে সম্বোধন করেছেন তা মন-মস্তিষ্কে এক বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে।

আরববাসীদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ ও আমন্ত্রণ।

এই পুস্তকেই অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, যার সারাংশ হল, হে আরবদের নেতাবর্গ এবং পবিত্র ভূমিদ্বয়ের বিশিষ্ট বাসিন্দাগণ! আমি ভারতের উলেমাদের সম্মুখে এই সকল বিষয় উপস্থাপন করেছি কিন্তু তারা তা স্বীকার করে নি। আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা বোঝে নি। আমি তাদেরকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা জাগে নি, বরং এর বিপরীতে তারা আমাকে অস্বীকার করে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় রত হয়েছে।

হে আরব, মিশর, সিরিয়া ও প্রমূখ দেশের ভ্রাতৃগণ! আমি দেখলাম যে, এটি একটি মহান নেয়ামত এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া মায়েদা দয়ালু খোদার পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান নিদর্শন, তাই আপনাদেরকে এর অংশ করব না, এমনটি আমি পছন্দ করি নি। সুতরাং আমি এর তবলীগ করা কর্তব্য মনে করলাম এবং এটিকে এমন এক ঋণ সদৃশ গণ্য করলাম যা সঠিক অর্থে পালন না করলে পরিশোধ হয় না।

আমি আপনাদেরকে সেই সকল কথা বলে দিয়েছি যা আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার জন্য প্রকাশ হয়েছে। তোমরা এর উত্তর কীভাবে প্রদান করবে আমি এখন তার প্রতীক্ষায় আছি।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮-৪৯০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মুগ্ধকর বাণীর প্রভাব

হুযুর (আ.)-এর বাণীর প্রভাব পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত হতে বাধ্য করে। কিন্তু সেই যুগে তাঁর পুস্তকাবলী আরবদের মাঝে পৌঁছানো দুরূহ বিষয় ছিল। এই কারণে সেই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর প্রভাব হয়তো আরব দেশসমূহে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এমন একটি উদাহরণ মজুত আছে যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মুগ্ধকর প্রভাবকেই প্রতিবিম্বিত করে। তারাবলীসের একজন প্রখ্যাত আলেম সৈয়্যদ মহম্মদ সাঈদ শামী যখন এই পুস্তক পাঠ করলেন, তখন তিনি অবলীলায় বলে উঠলেন: " খোদার কসম! এমন রচনা কোন আরব লিখতে পারে না।" তিনি এই কালামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আহমদীয়াত কবুল করেন।

(তারীখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৩)

মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় কাসীদাঃ

পুস্তক 'আত-তবলীগ'-এর শেষ ভাগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় অলৌকিক সৃদশ আরবী কাসীদা রচনা করেন। এই কাসীদা গুলি সৈয়্যদ মহম্মদ সাঈদ, শামীকে দেখানো হলে তিনি আবেগের আতিশয্যে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন: খোদার কসম বর্তমান কালের আরবদের কবিতা আমি কখনো পছন্দ করি নি, কিন্তু এই কাসীদাগুলি আমি মুখস্ত করব।

(তারীখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭৩)

এই কাসীদাগুলি জামাত আহমদীয়ার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। এর প্রারম্ভিক পঙক্তিটি হল,

يَا عَيْنَ فَيْضِ اللهِ وَالْعِرْفَانِ
يَسْعٰى اِلَيْكَ الْخَلْقُ كَالظَّمْاٰنِ

হযরত সৈয়্যদ মহম্মদ সাঈদ শামী সাহেবের প্রসঙ্গ যখন উঠল, তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করা যথোচিত হবে।

তিনি (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম অনুযায়ী সিরিয়ার আবদালদের মধ্যে প্রথম সেই পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান আলেম ছিলেন। তিনি 'ফখরুশ শো'রা' (কবিদের গৌরব) এবং 'মাজদুল আদবা' (সম্মানীয় বুদ্ধিজীবি) নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তারাবলাস শহরের বাসিন্দা ছিলেন যা বেরুত থেকে ত্রিশ কোশ দূরে অবস্থিত। তিনি তারাবলাস থেকে করাচির রাস্তা হয়ে করনাল যান এবং সেখান থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে হাকীম আজমল খান দেহলবীর কাছে আসেন। সেখানে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ মাদরাসা ফতেহপুরীতে আরবী শিক্ষাদানের কর্মে নিয়োজিত থাকেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক এবং বয়াত:

হযরত হাফিয মহম্মদ ইয়াকুব (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন যিনি দেরাদুনে থাকতেন। তাঁর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পরিচয় ঘটে। একবার শামী (রা.) সাহেব হাফিজ সাহেবের সান্নিধ্যে বসেছিলেন, এমন সময় হাফিয সাহেব আয়েনায়ে কামলাতে ইসলাম পুস্তকে (যা আরবীতে 'আত-তাবলীগ' নামে প্রকাশিত হয়) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় রচিত উপরোক্ত কাসীদাগুলি তাঁকে দেখান, যেগুলি পাঠ করে তিনি (রা.) তিনি অবলীলায় বলে ওঠেন:

"কোন আরবও এর থেকে উত্তম বাক্য লিখতে পারবে না"

'আত-তবলীগ'-এর ভাষার জাদু, কাসীদার সাহিত্যিক পূর্ণতা এবং অর্থের অসীম গভীরতা তাঁকে বিমোহিত করে তোলে এবং তিনি এর আকর্ষণে কাদিয়ানে চলে আসেন। তিনি প্রায় সাত মাস কাল অবধি গভীর অধ্যাবসায় নিয়োজিত থাকেন। হযরত আকদস (আ.)-কে খুব নিকট থেকে দেখেন এবং হুযুর (আ.)-এর জ্ঞান থেকে কল্যাণমন্ডিত হন। অবেশেষে কয়েকটি সুসংবাদ বিশিষ্ট সত্য-স্বপ্নের ভিত্তিতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

হযরত মহম্মদ সাঈদ সাহেব শামী (রা.) দু'টি পুস্তকও রচনা করেছেন। একটি হল ' আল আসাফ বায়নাল আহইয়া' এবং অপরটি হল 'ঈকাযুন নাস'

(আলামে রূহানী কে লাল ও জোহায়ের নম্বর;১৬৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঞ্জামে আথাম পুস্তকের শেষে ৩১৩ জন সাহাবীর যে তালিকা দিয়েছেন সেখানে তাঁর নাম ৫৫ উল্লেখিত আছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীতে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা নুরুল হকে শামী সাহেবের বিষয়ে বিশদের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধটিতে সংক্ষেপে হুযুর (আ.)-এর কয়েকটি বাক্য দেওয়া হল।

" আমি এই পুস্তকাবলী কেবল আরবের কেন্দ্রভূমিকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছি, যাতে সেই পবিত্র শহর গুলিতে আমার পুস্তকটি প্রকাশ পায়। আমি লক্ষ্য করলাম এই পুস্তকগুলি এই দেশসমূহে একজন পুণ্যবান ব্যক্তির হাতে প্রকাশ পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। .....সুতরাং আমি হাত উঠিয়ে দোয়া করলাম যে, যেন আমার এই আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। অবশেষে আমার দোয়া কবুল হল এবং খোদার কৃপা আমার দিকে এমন এক ব্যক্তিকে আকর্ষণ করল যিনি জ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী, বিচক্ষণ পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি তাঁকে একজন পবিত্র চেতা, আকর্ষণীয় চরিত্রসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত ও পুণ্যবান ব্যক্তি পেয়েছি।

অতঃপর হুযুর (আ.) তাঁর স্বভাব-চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন,

ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের একথাও জেনে রাখা উচিত যে, আরব দেশসমূহে পুস্তক প্রকাশ করার বিষয়টি এবং আমার পুস্তকের উচচাঙ্গের অর্থ আরববাসী পর্যন্ত পৌঁছানো কোন সাধারণ বিষয় নয়, এটি একটি মহান কাজ। এই কাজ সেই ব্যক্তিই সম্পাদন করতে পারে যে এর যোগ্য। ..... অতএব, এই জটিলতা এবং ধর্মীয় কারণে এই আলেমকে নির্বাচন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যার নাম হল মহম্মদ সাঈদী নিশার আল হামিদী আশ শামী।

অতঃপর হুযুর (আ.) এই সাহাবীর পাথেয় সংগ্রহের জন্য আবেদন করেন। তিনি (আ.) বলেন,

" নিজের ভাইয়ের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে দাও যেন তার সমুদ্র ও স্থল পথের যাত্রার ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট হয়। .....আর যারা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা যেন শীঘ্রই পাঠাবার ব্যবস্থা করে, কেননা সময় অপ্রতুল এবং অতিথি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। অতএব, যারা অবহেলায় আছেন তাদেরকে সতর্ক করা আমার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে।.....তোমরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এস, পশ্চাদপদ হয়োনা।.....খোদা তা'লার পথে পরস্পরের প্রতিযোগীতা কর।" (নুরুল হক, প্রথম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৯-২৯)

হামামাতুল বুশরা, মক্কাবাসীদের জন্য তবলিগী পুস্তক

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মহম্মদ বিন মাক্কী সাহেব (রা.) বয়াত গ্রহণের পর মক্কায় চলে যান এবং সেখানে তবলীগের কাজ আরম্ভ করেন। আলি তাই নামে নিজের এক বন্ধু সম্পর্কে হুযুর (আ.)-কে লেখেন এবং বলেন যে, তাকে পুস্তক প্রেরণ করুন, তিনি মক্কার আলেম এবং বিশিষ্টজনদের মধ্যে তা বিতরণ করবেন। এই পত্র প্রাপ্ত হলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে যথার্থ তবলীগের ঐশী উপকরণ জ্ঞান করে আরবী ভাষায় 'হামামাতুল বুশরা' রচনা করেন। এই পুস্তকে হুযুর (আ.) মসীহ হওয়ার দাবী, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর দলিলসমূহ, মসীহর নাযেল হওয়া এবং দাজ্জালের উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এছাড়াও উলেমাদের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ধর্ম-বিশ্বাস ও দাবীর উপর উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পুস্তকটি হুযুর (আ.) ১৮৯৩ সালেই রচনা করে ফেলেছিলেন, কিন্তু এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। এই পুস্তকে হযরত মহম্মদ বিন আহমদ মাক্কী সাহেবের চিঠিও লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মূখ্য পৃষ্ঠায় তিনি (আ.) দুটি পঙক্তি লিখেছেন। পঙক্তিটি হল:

حمامتنا تطير بريش شوق
وفي منقارها تحف السلام
إلى وطن النبي حبيب ربي
وسيد رسله خير الأنام

অর্থাৎ আমাদের পায়রা নিজের ঠোঁটে করে শান্তির উপহার নিয়ে ভালবাসার ডানা মেলে আমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রিয়ভাজন নবীদের সর্দার, নবী আকরম (সা.)-এর দেশের দিকে উড়ে চলেছে।

কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে সঙ্গ দেওয়ার আহ্বান

যেহেতু এই পুস্তক মক্কাবাসী এবং আরবের অন্যান্য শহরের লেখা হয়েছিল এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরবদের উদ্দেশ্যে প্রভাবশালী ভাষায় সম্বোধন করেছেন এবং তাদেরকে জামাতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

(হামামাতুল বুশরা, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮২-১৮৩)

আরবদের নিকট পুস্তক পৌঁছানোর ব্যকুলতা:

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরবদের কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পথে বাধা-বিপত্তির কথা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাষায় বর্ণনা করেছেন-

" আমি এই পুস্তক-পুস্তিকা আপনাদেরকে পাঠাতে চাইছিলাম, কিন্তু আমি শুনেছি যে, সুলতানের সৈন্যরা পথিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেয় এবং সেই সকল পুস্তক পড়তে আরম্ভ করে দেয় এবং নগণ্য মনে করে ফিরিয়ে দেয়। অতএব, হে প্রিয়গণ! তোমরাই বল যে, কিভাবে আমি এই পুস্তকাবলী প্রেরণ করি এবং কীভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে? আমি এখানে চেষ্টা করছি এবং অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাচ্ছি।

(হামামাতুল বুশরা, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮২)

আরবী ভাষায় অন্যান্য লিটেরেচার

এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরবদের মধ্যে তবলীগের জন্য ২২ টি পুস্তক আরবী ভাষায় রচনা করেন, যা খোদা তা'লা বিশেষ কুদরতের অধীনে তাঁকে শেখান। এই পুস্তকগুলি বিবেক সম্পন্ন আরব পাঠকদের মন হরণ করতে সক্ষম। এগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ আরবী ভাষায় লেখা হয়েছে এবং কিছু উর্দু পুস্তকের অংশ রূপে সামিল করা হয়েছে।

ইরাক ও আরবের উদ্দেশ্য তবলীগি দল এবং তবলীগের উদ্দেশ্যে আরবী রচনা লেখার ইচ্ছা

যে সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' রচনা করছিলেন সেই সময়ই জানা যায় যে, ইরাক ও আরবে হযরত মসীহ নাসেরীর কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে যা থেকে তার যাত্রা পথ সম্পর্কে জানা যায় এবং প্রমাণ হয় যে, তিনি কাশ্মীরে এসে বাস করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি দলকে ইরাক ও আরব প্রেরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন, যাতে তারা গিয়ে বিষয়টিকে নিজেরাই যাচাই করে

দেখে এবং সেই পথ ধরেই কাশ্মীর হয়ে কাদিয়ানে ফিরে আসে যে পথ হযরত মসীহ নাসেরী নিজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তিনি সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলটি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

" তাদের জন্য একটি আরবী পুস্তক রচনা করতে চাই যা তবলীগের কাজ করবে। এবং যে যে স্থানে তারা যাবে এই পুস্তকটি বিতরণ করতে থাকবে। এভাবে এই সফরে এই উপকারও হবে যে, আমাদের জামাতের প্রচার কার্যও সম্পাদন হবে। "

এই প্রতিনিধি দলকে বিদায় জানাতে ১২-১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ সালে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হয় যা জলসা আলবিদা নামে অভিহিত হয়ে আছে। কিন্তু কিছু জরুরী বিষয়ের কারণে এই প্রতিনিধি দল ইরাক ও আরবের জন্য রওনা হতে পারে নি।

(বিস্তারিত জানতে মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩৬ দেখুন)

আরব উলেমাদেরকে মোকাবেলার জন্য আমন্ত্রণ এবং পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

তবলীগের একটি মাধ্যম হল বিরোধীদের উপর ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা 'হুজ্জত' (অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করা) পূর্ণ করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঐশী তত্ত্বজ্ঞানকে অলৌকিকভাবে শেখা আরবী ভাষায় অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে বর্ণনা করে অস্বীকারকারীদের এর তুল্য রচনা আনার চ্যালেঞ্জ জানান। নিম্নে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল।

এজাযুল মসীহ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পীর মেহের আলী শাহ গোলড়ী-কে নিজের মোকাবেলায় সাবলীল ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কুরআন করীমের সুরা ফাতিহার তফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ দেন এবং বলেন,

" এই তফসীর লেখার জন্য বিশ্বের অন্যান্য উলেমাদের সহায়তা গ্রহণ করার অনুমতি তাকে দেওয়া হল। আরবদের মধ্যে ভাষাবিদদেরকে আহ্বান করতে পারেন, লাহোর এবং অন্যান্য আরব শহরের আরবীর প্রফেসরগণেরও সাহায্য নিন।" এই ঘোষণা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও তাঁর বিশেষ সমর্থনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ সালে সাবলীল ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় 'এজাযুল মসীহ' নামে একটি পুস্তকে সুরা ফাতিহার তফসীর প্রকাশ করেন। কিন্তু না পীর গোলড়ী সাহেব না কোন আরব বা অনারাব সাহিত্যিক এর তুল্য কোন পুস্তক রচনা করার সাহস হয়।

যখন ভারতের সমস্ত উলেমা এই পুস্তকে উত্তর দিতে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করল তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই পুস্তকটিকে আরবদেশের মক্কা ও মদিনা এবং মিশরের ও প্রমূখ দেশে প্রেরণ করা যথোচিত বিবেচনা করেন। মিশরের কয়েকটি স্থানে এই পুস্তক পাঠানো হয় এবং একটি পুস্তক 'আল-মিনার' পত্রিকার সম্পাদককেও পাঠানো হয়। যেহেতু এই পুস্তকে জিহাদ সংক্রান্ত ভ্রান্ত-ধারণা সমূহকে খণ্ডন করার দলিল-প্রমাণ ছিল, সুতরাং এই পুস্তকটি প্রেরণের নেপথ্যে উদ্দেশ্য ছিল মানুষের এই ভ্রান্ত মতবাদের সংশোধন করা। এই কারণে 'আল-মিনার' পত্রিকর সম্পাদক জিহাদ সম্পর্কিত হুযুর (আ.) রচনা পাঠ করে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে বিষয়টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে তীরস্কার ও গালি দেওয়ার পথ অবলম্বন করে। নিজের পত্রিকা 'আল-মিনার'-এ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এক অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক নামে সম্বোধন করত। এই পত্রিকাটি কোন ভাবে পাঞ্জাবে এসে পৌঁছায় এবং এটি কয়েকজন বিদ্বেষপরায়ণ মৌলবীর হাতে এসে পড়ে। তারা এটিকে উর্দুতে অনুবাদ করে এবং বেশি অতিরঞ্জিত করে অন্য একটি পত্রিকাতে প্রকাশ করে দেয়। এবং তারা লম্ফঝম্প করে লোকদের বলে বেড়াতো যে, দেখ! আরবীভাষার সাহিত্যিক মির্যা সাহেবকে কেমন বেকায়দায় ফেলেছে। অথচ 'আল-মিনার' পত্রিকার সম্পাদকের ক্ষোভের কারণ ছিল জিহাদ সম্পর্কিত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধটি। কারণ কাহেরাহ শহরেরই আরও একটি প্রসিদ্ধ 'আল-মানাযের'-এর সম্পাদক নিজের পত্রিকায় স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছে যে, 'এজাযুল মসীহ' পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতার ক্ষেত্রে অতুলনীয় এবং সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এর সদৃশ পুস্তক মৌলবীরা কখনোই লিখতে পারবে না। তিনি একথাও বলেন যে, পুস্তকটির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা প্রায় অলৌকিক পর্যায়ের। অনুরূপভাবে কাহেরা থেকেই প্রকাশিত খৃষ্টানদের পত্রিকা 'আল-হিলাল'- পত্রিকা সম্পাদকও পুস্তকটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

(ইশতেহার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮ নভেম্বর, ১৯০১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এজাযুল মসীহর উত্তর দিতে ভারত কিম্বা মিশরের উলেমারাই কেবল অপারগতা প্রকাশ করে নি বরং আজ পর্যন্ত এই অলৌকিক নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই অসাধারণ পুস্তকের উত্তর লেখার চেষ্টা করার সাহস কারোর হয় নি। এটিই নির্ধরিত ছিল, কেননা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে এই পুস্তকে লিখেছিলেন যে,

" আমি এই পুস্তকটির জন্য দোয়া করেছিলাম যে, আল্লাহ তা'লা যেন এই পুস্তকটিকে উলেমাদের জন্য অলৌকিক নিদর্শনে পরিণত করে এবং কোন সাহিত্যিক যেন এর সদৃশ পুস্তক রচনা করতে না পারে। আমার দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ তা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন: مَنَعَهُ مَانِعٌ مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ উদ্ধলোক থেকে আমি তাদেরকে নিরস্ত করব। আমি বুঝে যাই যে, এতে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে শত্রুরা এর সদৃশ পুস্তক রচনা করতে সক্ষম হবে না।

(এজাযুল মসীহর মূল আরবীর সারাংশ থেকে অনুদিত, রূহানী খাযায়েন,১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯)

অনুরূপভাবে পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি কঠোর সতর্কবাণী হিসেবে লেখেন:

فَإِنَّهُ كِتَابٌ لَيْسَ لَهُ جَوَابٌ.
وَمَنْ قَامَ لِلْجَوَابِ وَتَنَمَّرَ فَسَوْفَ يَرَى أَنَّهُ تَنَدَّمَ وَتَنَمَّرَ.

অর্থাৎ, এটি একটি অসাধারণ পুস্তক, যে ব্যক্তিই রোষে এসে এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তর লিখতে প্রস্তুত হবে, সে অপদস্ত হবে এবং অপূর্ণ বাসনার সাথে তার ইহলীলা সাঙ্গ হবে।

'আল-মিনার' পত্রিকার সম্পাদক শেখ রশীদ রাযা লিখেন:

" বিজ্ঞজনেদের অধিকাংশই এর থেকে উত্তম পুস্তক সত্তর দিনের স্থানে সাত দিনে লিখতে সক্ষম।" (আল-মিনারুল মাজলিদুর রাবে)

শেখ রশীদ রাযা সাহেব নিজে কি বলছেন সে সম্পর্কে হয়তো তাঁর কোন ধারণা ছিল না। তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, নবীদের উপর উত্থিত আপত্তিসমূহ প্রায় একই গোত্রের হয়ে থাকে। এবং নবীদের বিরোধীরা চিরকালই একই উত্তর দিয়ে এসেছে। মহানবী (সা.) এবং কুরআন করীমের উপর আপত্তিকারীরা বলেছিল:

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (الانفال:32)

অর্থাৎ: আমরাও ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা প্রাচীন লোকদের কাহিনী ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

(আল-আনফাল: ৩২)

পূর্বে তারা একথা বলেছিল আর আজকে শেখ রাযা সাহেব বলছেন এমন পুস্তক তো অনেকেই লিখতে পারে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, মক্কার কাফেররা কি কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিল? কখনোই নয়। এটিই তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার এবং পরাজিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অনুরূপভাবে শেখ রাযা সাহেব এই চ্যালেঞ্জের পর প্রায় ত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কি এর তুল্য বা এর থেকে উত্তম পুস্তক রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন? কখনোই নয়। সুতরাং এটি শেখ রাযা সাহেবের মিথ্যাচার এবং পরাভুত হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণিত হল।

অনুরূপভাবে মিশরের একটি পত্রিকা 'আল-ফাতাহ্' একথা লেখে যে, মির্যা সাহেব তাঁর অর্থহীন পুস্তক লেখার জন্য একজন সিরিয়াবাসীকে বেতন দিয়ে রেখেছিলেন। এই ব্যক্তিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিরোধীদের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন যেরূপে আঁ হযরত (সা.)-কে মক্কার কাফেররা ব্যঙ্গের স্বরে বলেছিল যে, মহম্মদ (সা.)-কে অন্য কোন ব্যক্তি শেখায়। এইভাবেই নবীদের বিরোধীরা হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে থাকে। তাদের কথার মধ্যে সবসময় পরস্পর বিরোধাভাস পাওয়া যায়।

* আরও একটি চ্যালেঞ্জ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শেখ রশীদ রাযার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও দুর্মুখতা সম্পর্কে অবগত হলে তিনি একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন যা সম্পর্কে পূর্বে কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছে। এই ইশতেহারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একথাও বলেন যে, আমি আরও একটি পুস্তক লিখছি যা আল মিনার পত্রিকার সম্পদককে পাঠানো হবে এবং তাঁকে এর তুল্য পুস্তক লেখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হবে।

(ইশতেহার, ১৮ই নভেম্বর, ১৯০১)

হুযুর (আ.) লিখেন:

" যদি আল-মিনার পত্রিকার সম্পাদক এর প্রতিক্রিয়ায় উত্তম উত্তর লিখতে সক্ষম হন তবে আমি আমার সমস্ত পুস্তক পুড়িয়ে দিব এবং তার চরণ চুম্বন করব। (আলহুদা ওয়াত তাবশিরা লেমাইঁয়ারা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৬৪)

অতঃপর হুযুর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে,

" আল-মিনার পত্রিকার সম্পাদক কি সাবলীল ও বাগ্মীতাপূর্ণ আরবী ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শীতা অর্জন করেছে? সে নিশ্চয় পরাজিত হবে এবং প্রতিযোগীতার ময়দানে আসবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সেই খোদার পক্ষ থেকে যিনি ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত যা শত-সহস্র পর্দার অন্তরালে রয়েছে।

(আলহুদা ওয়াত তাবশিরা লেমাইঁয়ারা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৬৪)

অনুরূপভাবে অন্যান্য সাহিত্যিক ও উলেমাদের সম্পর্কে তিনি বলেন,

" তারা কি ভাষাবিদ হওয়ার দাবী করছেন? তারা অচিরেই পরাজিত হবে এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পশ্চাদাপসরণ করবে।

(আলহুদা ওয়াত তাবশিরা লেমাইঁয়ারা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-২৬৪)

এই পুস্তক হুযুর (আ.) ১২ জুন, ১৯০২ সালে প্রকাশ করেন এবং এর একটি শেখ রশীদ রাযা সাহেবকেও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সাবলীল ও বাগ্মীতাপূর্ণ আরবী ভাষায় এর প্রতি উত্তর লিখে হুযুর (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা তার হয় নি।

মোয়াহেবুর রহমান

মিশরের পত্রিকা 'আল লুয়া'-র সম্পাদক মুস্তাফা কামাল পাশা ইংরেজি ভাষায় একটি ইশতেহার পান যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবী এবং তাঁর অনুসারীদের প্লেগের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা সম্পর্কে ঐশী প্রতিশ্রুতির উল্লেখ ছিল। ইশতেহারে সেই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবী করেন যে, আমাকে এবং আমার ঘরের মধ্যে বসবাসকারীদেরকে প্লেগের টিকা লাগানোর প্রয়োজন নেই। এই ইশতেহার দেখে মিশরী পত্রিকার সম্পাদক আপত্তি করেন যে, আপনি টিকা নিষেধ করে উপায়-উপকরণকে অস্বীকার করেছেন এবং প্রতিষেধক না নেওয়াকে আস্থাস্থল রূপে গণ্য করছেন। এটি কুরআন মজীদের পরিপন্থী এবং সুরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াত বিরোধী।

এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরবী ভাষায় 'মোয়াহেবুর রহমান' পুস্তক রচনা করেন যেটি জানুয়ারী, ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে হুযুর (আ.) সম্পাদক মহাশয়ের আপত্তিসমূহের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন এবং নিজের ধর্ম-বিশ্বাস ও জামাতের শিক্ষা ও নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এই পুস্তকটির প্রকাশ হওয়া সম্পর্কে হুযুর (আ.) বলেন: মোয়াহেবুর রহমানের প্রথম কুড়িটি কপি বাঁধিয়ে মিশরের পত্রিকার সম্পাদককে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। যদি আমার সামর্থ্য থাকত তবে, কয়েক হাজার পুস্তক বাঁধিয়ে পাঠাতাম। এখানকার মানুষের দুর্দশা চরম পর্যায়ের। হয়তো মিশরের মানুষই এর থেকে উপকৃত হবেন। খোদার নিকট যতসংখ্যক সৎ-আত্মা রয়েছে তিনি তাদেরকে আকর্ষণ করছেন। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭)

তিনি আরও বলেন- " দুই হাজার সংখ্যক পুস্তক ছাপানো হোক। আরবের যেখানে পাঠানোর প্রয়োজন হবে সেখানে পাঠিয়ে দিব। বিরোধীতাও আমাদের জন্য আশিস প্রমাণিত হয়। তারা যা কিছু লেখে আমাদের মঙ্গলের জন্যই লেখে, নচেত আলোড়ন কীরূপে সৃষ্টি হবে?"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৪)

'আত-তাবলীগের' প্রতি একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক আত-তাবলীগও হযরত মহম্মদ সাঈদ শামী সাহেব এত গভীরভাবে প্রভাবিত করে যে, তিনি এই পুস্তকের সাবলীলতা ও বাগ্মীতা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রেমে বিভোর হয়ে গেলেন। সেখানে বাগদাদ থেকে হায়দারাবাদ দক্ষিণে আগত সৈয়্যদ আব্দুর রাযযাক কাদরী বাগদাদী নামে এক ব্যক্তিও এই পুস্তকটি পড়েন। তিনি পুস্তকটি পড়ে একটি ইশতেহার এবং আরবী ভাষায় একটি চিঠি লিখে হুযুর (আ.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন যেখানে তিনি হুযুর (আ.)-এর দাবীকে শরীয়ত বিরোধী এবং এমন দাবীদারকে হত্যাযোগ্য আখ্যায়িত করেন। শুধু তাই নয় 'আত-তাবলীগ' পুস্তকটিকে কুরআন বিরোধী বলে অভিহিত করেন । হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার চিঠিটিকে সদিচ্ছা প্রণোদিত বিবেচনা করে অত্যন্ত ভালবাসা সহকারে আরবী ভাষায় তাকে জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'তোহফা বাগদাদ' রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি (আ.) শেখ বাগদাদীর যাবতীয় সংশয়ের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন। এবং নিজের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ দেন। এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, উম্মতের মহম্মাদীয়ায় খোদা তা'লার সঙ্গে বার্তালাপের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তিনি তাকে এ সম্পর্কে মৌলবীদের প্ররোচনা থেকে সতর্ক থাকার উপদেশ দেন এবং তাঁকে নিজের কাছে এসে পরিস্থিতির চাক্ষুস দর্শন করে বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পরামর্শ দেন যাতে তিনি সত্যকে পেয়ে যান। আর যদি তিনি দীর্ঘ যাত্রা অবলম্বন করতে না পারেন তবে আল্লাহ্ তা'লার নিকট এক সপ্তাহ পর্যন্ত দোয়া চান। দোয়া চাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, দোয়া (ইসতেখারা) করার সময় আমাকেও অবহিত করুন যাতে আমিও দোয়া করতে পারি। এই পুস্তকটি তিনি (আ.) একটি কাসীদার মাধ্যমে শেখ বাগদাদীকে বলেন-

" আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত দিন, আমার হত্যা কি তোমার জন্য সন্তুষ্টির কারণ হবে? আমার মত মানুষের ধ্বংস হওয়ার কি কোন যৌক্তিকতা আছে?"

শেখ বাগদাদী বলেছিল যে, নাউযুবিল্লাহ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মিথ্যাবাদী এবং তরবারীই হল তাঁর প্রতিকার। একথার উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাসীদায় বলেন-

হে সেই ব্যক্তি ! যে আমার বিরোধীতায় আমাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করার হুমকি দিচ্ছ, তুমি এ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ যে, আমার প্রিয় নবী (সা.)-এর ভালবাসার তরবারী আমার উপর অনেক পূর্বেই চালিত হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা রহস্য উদ্ঘাটনের স্বীকারুক্তি

যখন হযরত মসীহ (আ.)-এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর হিজরত সম্পর্কে বিরাট রহস্য উদ্ঘাটনের বিষয়ে আরবদেশে পৌঁছায় তখন 'আল-মিনার' পত্রিকার সম্পাদক শেখ রশীদ রাযা লেখে-

"হযরত মসীহ নাসরী (আ.)-এর ভারতের দিকে হিজরত করা এবং সেই দেশে গিয়ে মৃত্যু বরণ করা যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অলীক কল্পনা নয়। " (তাফসীর, আল-মিনার, ৬ষ্ঠ-খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩)

অনুরূপভাবে আরও একজন প্রখ্যাত পন্ডিত ও সাহিত্যিক মাহমুদ আব্বাস আক্কাদ তাঁর রচিত পুস্তক 'হায়াতুল মসীহ ও কাশ্‌ফুল আসরিল হাদিস' -এ মসীহ (আ.)-এর সমাধি সম্পর্কে হুযুর (আ.)-এর উদ্ঘাটনের উল্লেখ করে বলেন যে, বিষয়টিকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৩০)

আরবদের মধ্যে তবলীগের অন্যান্য মাধ্যম

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে অলৌকিক ভাবে শেখানো সাবলীল ও বাগ্মীতাপূর্ণ আরবী ভাষায় রচিত পুস্তকাবলীর দ্বারা আরবদের মধ্যে তবলীগ করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি তবলীগের উদ্দেশ্যে অন্যান্য মাধ্যমও অবলম্বন করেছেন। সেগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে।

ফোনোগ্রাফের মাধ্যমে আরবী বক্তব্য রেকর্ড করানোর প্রস্তাবঃ

৩১শে অক্টোবর, ১৯০১ সালের মালফুযাতের ডায়েরীতে লেখা আছে যে, হযরত আকদস (আ.) প্রতিদিনের ন্যায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বার হন। পথিমধ্যে ফোনোগ্রাফের আবিষ্কার ও তার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এরই মধ্যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, হযরত আকদস (আ.)-এর একটি চার ঘন্টা দীর্ঘ আরবী বক্তৃতা এর মধ্যে রেকর্ড করা হোক এবং এই বক্তৃতার পূর্বে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের একটি পরিচিতি মূলক বক্তৃতা রাখা হোক যার বিষয় বস্তু হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর সব থেকে মহান ব্যক্তি যিনি নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ দাবী করেছেন এবং মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ নামে পৃথিবীতে আবির্ভুত হয়েছেন যিনি ভারতভূমির হাজার হাজার মানুষকে নিজের পক্ষে করেছেন, যাঁর হাতে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে , খোদা তা'লা যাঁকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন তিনি মুসলিম বিশ্বকে আহ্বান করছেন। শ্রোতৃবর্গ! আপনারা নিজেই তাঁর বক্তব্য শুনুন যে তিনি কি দাবী করেছেন এবং এর পক্ষে তাঁর যুক্তি-দলিল কি? এই ধরণের একটি বক্তব্যের পর হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য হবে, আর যেখানে যেখানে এরা যাবে সেখানে এটি খুলে শোনানো হোক।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৮)

যদিও কোন কারণে প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হয় নি, কিন্তু এই বর্ণনাটি থেকে হুযুর (আ.) এবং তাঁর সাহাবীদের মনে আরবদের মধ্যে খোদার মসীহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার ব্যকুলতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

মিশরে তবলীগ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আরবদের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এই ব্যকুলতা সম্পর্কে ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৯০২ সালের মালফুযাতের ডায়েরির সেই অংশ থেকে অনুমান করা যায় যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে: একজন আহমদী হজ্জে যাওয়ার সময় কিছুকাল মিশরে অবস্থান করেন এবং এখনও পর্যন্ত সেখানেই রয়েছেন এবং সেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর প্রচার করছেন। তিনি লিখেছিলেন যে, যদি আদেশ হয় তবে আমি এই বছর হজ্জ মুলতবি রাখব আর আমাকে যদি আরও পুস্তক পাঠানো হয় তবে আমি সেগুলি প্রচার করব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: তাঁকে পত্র লিখে জানানো হোক যে, পুস্তক পাঠানো হবে। সেগুলির প্রচারের জন্য মিশরের অবস্থান করুন। হজ্জ ইনশাল্লাহ্ আগামী বছর করবেন। 'মান আতাআর রাসুলা ফাকাদ আতাআল্লাহা।'

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩-৩২৪)

কাদিয়ান আগমণকারী আরবদের মধ্যে তবলীগ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে, যাচাই করার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে আসুন এবং আমার কাছে এসে কাদিয়ানে এসে অবস্থান করুন। দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শন দেখে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আরব-বিশ্বের প্রথম আহমদী এবং সিরিয়ার প্রথম আব্দালও এইভাবেই এসেছিলেন এবং হিদায়াত পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এছাড়াও যদি কেউ কেবল জানবার ও শিখবার উদ্দেশ্যে এসেছেন তবুও তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এবং যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। মালফুযাত থেকে দু-একটি পেশ করা হচ্ছে।

মালফুযাত ৩য় খণ্ডে লেখা আছে যে, ১৯০২ সালের জানুয়ারী প্রারম্ভে একজন আরব ব্যক্তি আসেন যার সম্পর্কে হুযুর (আ.) কে ইলহাম হয় যে, দোয়া ছাড়া তার জন্য কোন কিছুই উপকারে আসবে না। তিনি (আ.) দোয়া করেন। ৯ জানুয়ারী, ১৯০২ সালে হুযুর (আ.) সকালে যখন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হন, তিনি আরবী ভাষায় একটি বক্তব্য রাখেন, যেখানে তিনি মুহাম্মদীয়া সিলসিলা ও মুসবীয়া সিলসিলার সাদৃশ্য বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি সুরা নুরের আয়াত ইসতেখলাফ এবং সূরা তাহরীম থেকে নিজের দাবীর সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ রাখেন।

এর ফলে, সেই আরব ব্যক্তি যিনি প্রথমে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে কথা বলতেন, তিনি নিবৃত্ত হন। তিনি সত্য মনে বয়াত গ্রহণ করেন এবং একটি ইশতেহারও প্রকাশ করেন। অবশেষে তিনি অসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে তবলীগের উদ্দেশ্যে নিজের দেশের ফিরে যান। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০)

১৩ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ সালে লখনউ থেকে একজন ডাক্তার সাহেব আসেন, যার নাম আল-বদরে ইউসুফ নামে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে তিনি বাগদাদী বংশের মানুষ ছিলেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ লখনউ-তে বসবাসরত ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি মগরিবের পর হযরত আকদস (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য

উপস্থিত হলেন। হুযুর (আ.)-এর সঙ্গে তার বার্তালাপ হয়।

এই নবাগত ব্যক্তি একাধিক প্রশ্ন করেন এবং অবশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ধৈর্য্য, চারিত্রিক গুণ এবং সত্যতার দলিল-দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে নিজেদের জন্য দোয়ার আবেদন করেন এবং বলেন:

" আমি সত্য কথা বলছি, আমি আপনাকে উপহাস করব, এমন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু খোদা তা'লা আমার উদ্দেশ্যকে থেকে নিবৃত্ত করলেন। এখন আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না যে আপনি মসীহ মওউদ নন। বরং মসীহ মওউদ হওয়ার দিকটি বেশি ভারি। আমি অনেকাংশে বলতে পারি যে, আপনি মসীহ মওউদ। .....কালকের থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আজ ভিন্ন।..... যেহেতু আমি তাদের প্রতিনিধি যারা আমাকে পাঠিয়েছে, এই কারণে আমি প্রত্যেকটি বিষয়কে যাচাই না করে মেনে নিতে চাই নি।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮২-১১০)

হুযুর (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর তবলীগের ফল

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ্ তা'লা কতিপয় আরবকে হিদায়াত দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে তিন জন আরব ব্যক্তির উল্লেখ ইতিপূর্বেই হয়েছে। এঁরা ছাড়া আরও একজন আরব সাহেব ছিলেন আব্দুল্লাহ (রা.) যিনি সিন্ধু দেশের একজন প্রখ্যাত পীর সাহেবে ইলম-এ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পীরের নির্দেশে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করে সেখানেই থেকে যান। তিনি ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে কোন এক সময় বয়াত করেছিলেন কেননা, তাঁর সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হামামাতুল বুশরায় উল্লেখ করেছেন, যেটি ১৮৯৩ সালের রচনা।

সৈয়্যদ আব্দুল্লাহ্ আরব সাহেব আরবী ভাষায় একজন শিয়া আলি হায়েরীর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন যেটির নাম ছিল সাবীলুর রাশ্‌শাদ'। তিনি যখন এই পুস্তিকাটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট উপস্থাপন করেন, তখন তিনি (আ.) এর প্রশংসা করেন এবং বলেন- " উৎকৃষ্ট লেখনী এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছো।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৮-১৬৯)

এছাড়াও জামাতের ইতিহাসে দুই জন এমন সাহাবার উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের সম্পর্ক বাগদাদের সঙ্গে ছিল এবং যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাদের নাম হল: হযরত হাজী মাহদী সাহেব আরবী বাগদাদী নাযিল মাদ্রাস এবং হযরত আব্দুল ওহহাব সাহেব বাগদাদী।

অনুরূপভাবে আরও একজন আরবী সাহাবী হযরত সৈয়্যদ আলি,পিতা শরীফ মুস্তাফা আরব, যাঁর বয়াতও আনুমানিক ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যবর্তী সময়। তাঁর একটি চিঠি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'সাচ্চাই কা ইযহার' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, যেটি ১৮৯৩ সালের রচনা।

(সাচ্চাই কা ইযহার, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৬-৮০)

এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-রচনাবলীতে তায়েফের হযরত উসমান আরব সাহেব (রা.)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর বয়াত প্রারম্ভিক যুগের।

আরও একজন আরব সাহাবী হযরত আব্দুল মুহী আরব (রা.) তিনি ইরাকের অধিবাসী ছিলেন এবং শিয়া সম্প্রদায় থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সাহচর্য লাভ করেছিলেন। সীরাতুল মাহদীর ২য় খণ্ডে, ১২০০ নম্বর রিওয়াত-এ তাঁর বয়াতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত রয়েছে:

" মালিক মৌলা বখশ সাহেব পেনশনর মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব মুবাশ্বির লিখিত বর্ণনা করেন যে,আব্দুল মুহী নামে এক ব্যক্তি কাদিয়ান এসেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আকদস (আ.)-এ কয়েকটি আরবী পুস্তক দেখে বিশ্বাস করে নিই যে, এমন আরবী খোদার তা'লার সাহায্য ছাড়া কেউ লিখতে পারে না। সুতরাং আমি কাদিয়ানে আসি। এবং হুযুর (আ.)-এর নিকট জানতে চাই যে, এই আরবী কি আপনার নিজের লেখা? হুযুর (আ.) বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কৃপা ও সাহায্যে। এর প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে বললাম যে, আপনি যদি এমন আরবী আমার সামনে লিখতে পারেন তবে আমি আপনার দাবীকে সত্য বলে স্বীকার করে নিব। হুযুর (আ.) বললেন, এটি তো তাৎক্ষণিক নিদর্শন দেখার দাবি করা। এমন নিদর্শন প্রকাশ করা নবীদের সুন্নতের পরীপন্থী। আমি তো কেবল তখনই লিখতে পারি যখন খোদা আমার দ্বারা লেখান। এই উত্তর শুনে আমি অতিথিশালায় চলে আসি। এবং পরে আরবীতে হুযুর (আ.)-কে একটি চিঠি লিখি। হুযুর সেটির উত্তর আরবীতে প্রদান করেন। যেটি ঠিক তদ্রূপই ছিল। সুতরাং আমি বয়াত গ্রহণ করি।"

হযরত আব্দুল মুহী আব সাহেবও বয়াত করে কাদিয়ানেই থেকে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) যুগে তারনাম একাধিক বার বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। হযরত আব্দুল মুহী আরব (রা.) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) -এর সঙ্গে প্রথম খলীফার যুগে আরবদেশগুলির ভ্রমণ করেন এবং হজ্জ করেন। তিনি জামাতে আহমদীয়ার প্রথম আরবী পত্রিকা 'মাসালেহুল আরব'-এর সম্পাদক হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। (তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১০)

জামাতের ইহিতাসে আব্দুল হাঈ আরব এবং আব্দুল মুহী আরব নামে দুই জন আরব সাহাবার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এটি আসলে একই ব্যক্তির দুটি নাম।

অনুরূপভাবে আরও একজন আরবী সাহাবী আহমদ রশীদ নওয়াব সাহেবেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি ১৯০৫ সালে বয়াত করেন।

হযরত সেঠ আবু বাকার ইউসুফ সাহেবও আরবদের মধ্যে ছিলেন এবং দীর্ঘকাল থেকে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন। বয়াতের পর তিনি কাদিয়ানে স্থীয়ভাবে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে তাঁর এক কন্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জানুয়ারী ১৯০৭ সালে মিশরের শহর ইস্কেন্দ্রিয়া থেকে আহমদ যাহরী বদরুদ্দীন নামে একজন ব্যক্তির চিঠি পান যাতে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেন।

আরবদের এই আগমণের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আরবী পুস্তকাবলী ইন্টারনেটের উপলব্ধ হওয়ার পাশাপাশি আরও কয়েকটি উর্দু পুস্তকও আরবী ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং যা সহজলভ্য। এছাড়াও একটি চ্যানেল দিবা-রাত্রি তবলীগী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরবদের মধ্যে তবলীগের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এর ফলও প্রকাশ পাচ্ছে। আলহামদোলিল্লাহ আলা যালিকা।

****

লাহোরের সর্ব-ধর্মসম্মেলন এবং বিভিন্ন ধর্মের মোকাবিলায় ইসলামের মহান বিজয়

সুধী পাঠকবর্গ! মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে শরিয়ত পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআান মজীদে বলেন,

"আজকের দিন ইসলামকে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত ধর্ম হিসেবে পছন্দ করলাম।"

(আল-মায়েদা: ৪)

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে শরিয়ত পূর্ণতা লাভ করল। আর আল্লাহ্ তা'লা শরিয়তের প্রচার ও প্রসারের পূর্ণতা এবং ইসলামের বিজয়ের সংবাদ প্রদান করে বলেন,

অর্থাৎ তিনিই তাঁহার রসুলকে হিদায়ত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন, যাতে তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, মুশকের গণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন। (আস-সাফ: ১০)

অনুরূপভাবে বলেন,

তিনিই তাঁহার রসুলকে হিদায়ত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন, যাতে তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(আল-ফাতাহ : ২৯)

স্পষ্ট থাকে যে, কুরআনের মুফাসসিরগণ এবিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, উপরোক্ত আয়াতগুলিতে ইসলামের যে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে নির্ধারিত আছে।

সুতরাং এই শেষ যুগে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনুসারেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী করেন। তিনি (আ.) বলেন: আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং যার নামে মিথ্যা রচনা করা অভিশাপের কাজ, তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে পাঠিয়েছেন। আর যেরূপ আমি কুরআন শরীফের আয়াতের উপর বিশ্বাস রাখি, অনুরূপে বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছাড়াই খোদা তা'লার এই প্রকাশ্য ওহীর উপর ঈমান রাখি যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, একের একের পর নিদর্শনের মাধ্যমে যেগুলির সত্যতা আমার উপর প্রকাশিত হয়েছে। আমি বায়তুল্লাহ্-তে দাঁড়িয়ে কসম খেতে পারি যে, যে সমস্ত পবিত্র ওহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়, এগুলি সেই আল্লাহ্র বাণী যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মহম্মদ (সা.) এর প্রতি আপন বানী প্রেরণ করেছিলেন। পৃথিবী আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আকাশও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে।

(এক গলতী কা ইযালা, পৃষ্ঠা- ৬)

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন ও আহাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একের পর এক তর্কসভা, মোবাহিলা (দোয়ার মাধ্যমে কোন বিষয়ের সমাধান করার জন্য আহ্বান করা), মোজেযা, এবং পুস্তক রচনার মাধ্যমে অচল ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। সর্ব-ধর্মসম্মেলন সেরকমই একটি মাধ্যমে যারা দ্বারা ইসলাম একটি অন্য মাত্রা অর্জন করেছিল। এই জলসার মাধ্যমে একটি মিশ্র ধর্মীয় মঞ্চে ইসলাম এবং ইসলামের সফল উকিল হওয়ার সুবাদে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এমন এক মহান বিজয় লাভ করে যা ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে থাকবে।

জলসার পটভূমি

এই জলসা আরম্ভ করেন সামী সাধু শোগন চন্দ্র নামে জনৈক এক হিন্দু ব্যক্তি। শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। যৌবনের কিছু কাল চাকুরি জীবিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাধুতে পরিণত হন। গুজরাতের এক সন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরী হয়। সেই সন্যাসীর আদেশে তিনি তিন-চার বছর পর্যন্ত হিন্দুদের কায়স্থ জাতির সংশোধনের নিমিত্তে নিজেকে নিয়োজিত করেন। অবশেষে ১৮৯২ সালে তাঁর মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলে একত্রিত না হই কোন উপকার হবে না। অতএব তিনি একটি ধর্মীয় সম্মেলন আয়োজন করার পরিকল্পনা করেন। এই ধরণের প্রথম জলসা বা সম্মেলন আজমেরে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৯৬ সালে দ্বিতীয় সম্মেলনের জন্য লাহোরের পরিবেশকে উপযুক্ত মনে করে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

(রিপোর্ট জলসা আযম মযাহেব, পৃষ্ঠা: ২৫৩-২৫৪)

সম্মেলনের আয়োজন

সামী সাহেব সম্মেলনকে বাস্তবরূপ দিতে এবং ব্যাপক পরিসরে ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন যার সভাপতি ছিলেন মাস্টার দুর্গা প্রসাদ এবং চিফ সেক্রেটারী ছিলেন লাহোর হাইকোর্টের একজন হিন্দু প্লাডর লালা ধনপত রায় বি.এ.এল.এল.বি। উক্ত কমিটি সম্মেলনের জন্য পাঁচটি প্রশ্ন প্রস্তাব করে। যেগুলি হল-

১) মানুষের শারিরিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা।

২) মৃত্যুর পরের অবস্থা। অর্থাৎ পরলৌকিক অবস্থা।

৩) পৃথিবীতের মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং সেটি কীভাবে পূর্ণ হতে পারে?

৪) ইহকাল ও পরকালের উপর কর্মের প্রভাব কী?

৫) ঐশী-জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করার কি কি মাধ্যম রয়েছে?

(রিপোর্ট জলসা আযম মযাহেব, পৃষ্ঠা: ২৫৩-২৫৪)

সম্মেলনের জন্য ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর তারিখ নির্ধারিত হয়। জলসা প্রাঙ্গণের জন্য আঞ্জুমান হিমায়াতুল ইসলাম লাহোর হাইস্কুল প্রাঙ্গণকে নেওয়া হয়। (তবলীগ রিসালত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭)

জলসার কার্যনির্বাহের জন্য ছয় জন সালিশ নামাঙ্কিত হন। এরা হলেন-

১) রায় বাহাদুর বাবু প্রতুল চন্দ্র সাহেব, প্রধান বিচারপতি চিফ কোর্ট পাঞ্জাব। (২) খান বাহাদুর শেখ খোদা বখশ সাহেব, বিচারপতি সিমালকায কোর্ট লাহোর। (৩) রায় বাহাদুর পণ্ডিত রাধা কৃষ্ণ সাহেব, কোল প্লাডার চিফ কোর্ট, প্রাক্তন গভর্নর জম্মু। (৪) হযরত মৌলবী হাকীম নুরুদ্দীন সাহেব শাহি হাকিম (৫) রায় বাওয়ানী দাস সাহেব, এম.বি.এ, এক্সট্রা সেটলমেন্ট অফিসার জম্মু। (৬) জনাব সর্দার জোয়াহার সিং সাহেব, সেক্রেটারী খালসা কমিটি লাহোর।

(রিপোর্ট জলসা আযম মযাহেব)

সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি।

সামী শোগন চন্দ্র সাহেব কমিটির পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুসলমান, খৃষ্টান এবং আর্যধর্মাবলম্বীদেরকে তাদের প্রখ্যাত আলেমদেরকে অবশ্যই এই জলসায় নিজেদের ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

প্রকাশ করার অনুরোধ জানান। তিনি লেখেন-

" এখন এই অধম সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের নিকট নিজের ধর্মের উৎকৃষ্ট গুণাবলীর প্রকাশ এবং মানবতার প্রতি সহমর্মিতার জন্য সচেষ্ট। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করছি যে, লাহোরের টাউন হলে ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩ সনে অনুষ্ঠেয় বিরাট সব-ধর্মসম্মেলনের উদ্দেশ্য হল সত্য ধর্মের উৎকর্ষ এবং বৈশিষ্ট্য ভদ্রজনেদের একটি সভায় উন্মোচিত হওয়া এবং তার প্রতি সকলের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করা এবং তার যুক্তি-প্রমাণ লোকেদের বোধগম্য করা। এইভাবে প্রত্যেক ধর্মের বিশিষ্ট বক্তাকে নিজের ধর্মের সত্যতা এবং অপরের নিকট হৃদয়াঙ্গম করানোর সুযোগ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে শ্রোতাদেরকেও এই সুযোগ প্রদান করা হবে যেন তারা ঐ সকল বিশিষ্টজনেদের সভার প্রত্যেকটি ভাষণকে অপরের ভাষণের সাথে তুলনা করে দেখতে পারে এবং যেখানে সত্যের জ্যোতিঃ দেখবে সেটি যেন তারা গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর এই সমস্ত বক্তব্যগুলি একত্রে জনসাধারণের হিতার্থে ইংরেজি ভাষায় ছাপা হবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমানে ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে সকলের মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তি সত্য ধর্মের সন্ধানে আছে, প্রত্যেক হৃদয় প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে জানতে উৎসুক। কিন্তু প্রশ্ন হল এটা কি উপায়ে জানা সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তরে যতদূর বিবেক-বুদ্ধি পৌঁছাতে পারে, সেই মত উত্তম পন্থা হল সমস্ত ধর্মের সম্মানীয় বক্তাদের একত্রিত করা এবং ইশতেহার প্রকাশিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মের গুণাবলী বর্ণনা করা। অতএব প্রমূখ ধর্মগুলির মধ্যে থেকে যে ধর্মটি বাস্তবপক্ষে সত্য পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে হবে এই সম্মেলনে সেটি সুস্পষ্টরূপে নিজের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করবে। এই উদ্দেশ্যেই এই জলসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আর এর মধ্যে এমন কোন কিছু নেই যাতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আপত্তি থাকতে পারে। এটি সম্পূর্ণ বিদ্বেষয়হীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব এই অধম প্রত্যেক ধর্মের সম্মানীয় বক্তার নিকট সবিনয় নিবেদন করছে যে, অধমের এই উদ্দেশ্য পুরণ করতে সহায়তা করুন। এবং অনুগ্রহপূর্বক নিজের ধর্মের বৈশিষ্ট তুলে ধরার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে উপস্থিত হয়ে বাধিত করুন। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইশতেহারে প্রকাশিত শর্তাবলী উল্লঙ্ঘন করে কোন বিরুদ্ধ আচরণ করা এবং অশালীন ভাষা প্রয়োগ হবে না। শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই জলসা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক জাতির বুযুর্গ বক্তাগণের প্রত্যেকেই ভালভাবে জানেন যে,স্বধর্মের সত্যতা প্রকাশ করা তাঁদের কর্তব্য। সুতরাং, যে অবস্থায়, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে, তা হচ্ছে সত্য প্রকাশিত হোক। কাজেই, খোদা তা'লাও এই উদ্দেশ্য সাধনে জন্য একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন, যা সব সময় মানুষের জন্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর হয় না।

অতঃপর তিনি বলেন: আমি কি একথা মেনে নিতে পারি যে, এক ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যান্যা ব্যক্তিরা এক প্রাণঘাতী ব্যধিতে আক্রান্ত এবং সে এই দৃঢ় বিশ্বাসও পোষণ করে যে, তাদের নিরাময়ের ঔষধ কেবল তারই কাছে আছে, এবং সে মানুষের প্রতি সহানুভূতিও রাখে; আর এই অবস্থায় গরীব রোগীরা তাকে চিকিৎসার জন্য ডাকলে সে জেনে শুনে চুপ করে থাকবে? আমার প্রাণ তো এই জন্য ছটপট করছে যে, এটা ফায়সালা হয়ে যাক, কোন ধর্ম সত্য এবং সত্যতায় পরিপূর্ণ। আমার অন্তরে এই গভীর আবেগ আমি যে কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো, তা আমার জানা নেই। আমি জাতিসমূহের বুযুর্গগণকে কোন আদেশ নয় বরং সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। আমি এখন মুসলমানদের সম্মানীয় উলেমাদের সমীপে তাদের খোদার কসম দিয়ে সবিনয় নিবেদন করছি যে, যদি তারা নিজেদের ধর্মকে খোদার পক্ষ থেকে বলে বিশ্বাস করে তবে এই উপলক্ষ্যে নিজেদের সেই নবীর সম্মানের জন্য জলসায় অংশগ্রহণ করুন যার জন্য আপনারা নিজেকে উৎসর্গিত বলে মনে করেন। অনুরূপভাবে পাদরী সাহেবদের নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে আবেদন করছি যে, যদি তারা নিজেদের ধর্মকে প্রকৃতই সত্য ধর্ম এবং মানুষের মুক্তির মাধ্যম রূপে ধারণা করেন, তবে আপনাদের একজন উচ্চমানের ওয়ায-নসীহতকারী বুযুর্গ স্বধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেএই জলসায় আগমণ করুন। যেরূপ আমি মুসলমানদেরকে কসম দিয়েছি, অনুরূপে বুযুর্গ পাদরী সাহেবগণকেও হযরত মসীহর কসম দিচ্ছি এবং তাঁর ভালবাসা, সম্মান ও মর্যাদার দোহাই দিয়ে আপনাদের নিকট নিবেদন করছি যে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হলেও সেই কসমের সম্মানে অবশ্যই এই জলসায় তাদের মধ্যে একজন উচ্চপর্যায়ের বুযুর্গ স্বধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে আগমণ করুন। অনুরূপভাবে আর্যসমাজের আমাদের ভ্রাতাগণকে পবিত্র বেদ অবতীর্ণকারী তাদের সেই পরমেশ্বরের কসম দিয়ে নিবেদন করছি যে, জলসায় অব্যশই কোন উচ্চ পর্যায়ের ওয়ায-নসীহতকারী বুযুর্গকে প্রেরণ করুন যিনি বেদের পবিত্র শিক্ষার সৌন্দয্য বর্ণনা করবেন। আমি সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ব্রহ্মসমাজের বন্ধুগণের নিকটও একই আবেদন করব।"

ধর্মসমূহের প্রতিনিধিবর্গ

এই ইশতেহারের ফলে বিভিন্ন ধর্মের ১৭ জন প্রতিনিধি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

১) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) (ইসলামের প্রতিনিধি)

২) মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী (ইসলামের প্রতিনিধি)

৩) মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী (ইসলামের প্রতিনিধি)

৪) মুফতি মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব টোঙ্কি (ইসলামের প্রতিনিধি)

৫) মৌলবী আবু ইউসুফ মুবারক আলি সাহেব (ইসলামের প্রতিনিধি)

৬)ঈশ্বরী প্রসাদ সাহেব (সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি)

৭) পণ্ডিত গোপীনাথ সাহেব সেক্রেটারি সনাতন ধর্মসর্ভ লাহোর সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি)

৮) ভানুদত্ত সাহেব, পরীক্ষক পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি)

৯) রায় বারওয়াহ কুন্টা সাহেব ((প্রতিনিধি থিওসোফিকাল সোসাইটি)

১০) বাবু বিজারাম চ্যাটার্জী সাহেব শেখর (প্রতিনিধি আর্য সমাজ)

(১১) মাস্টার দূর্গা প্রসাদ সাহেব (প্রতিনিধি আর্য সমাজ)

১২) পণ্ডিত গোবর্ধন দাস সাহেব (প্রতিনিধি ফ্রি থিঙ্কর)

১৩) সর্দার জোহায়ের সিং সাহেব (প্রতিনিধি শিখ ধর্ম)

১৪) মাস্টার রাম জি দাস সাহেব (প্রতিনিধি হারমোনিকাল সোসাইটি)

১৫) লালা কাঁশীরাম সাহেব সেক্রেটারী ব্রহ্মসমাজ (প্রতিনিধি ব্রহ্ম সমাজ)

১৬) মি: জে.মরিশন সাহেব বাহাদুর জার্নালিস্ট লাহোর (প্রতিনিধি খৃষ্টধর্ম)

১৭) মি: রাও সাহেব বাহাদুর, সাবেক হেডমাস্টার ইচিসন হাইস্কুল লাহোর (প্রতিনিধি খৃষ্টধর্ম)

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তাঁর নিজের প্রবন্ধ সবার উপর বিজয়ী হওয়া সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ভবিষ্যদ্বাণী।

সামী শোগান চন্দ্র সাহেব জলসার ইশতেহার দেওয়ার পূর্বে কাদিয়ান এসেছিলেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমি একটি ধর্মীয় জলসার আয়োজন করতে চাই। আপনিও নিজের ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ লিখুন যাতে এই জলসায় পাঠ করা যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের অসুস্থতার কথা তাকে জানান, কিন্তু তিনি অনেক পিড়াপিড়ি আরম্ভ করেন এবং বলেন যে, আপনি অবশ্যই লিখুন। যেহেতু তিনি (আ.) বিশ্বাস করতেন যে, তিনি খোদার আদেশ ছাড়া বলতে পারেন না এই কারণে তিনি খোদার তা'লার নিকট দোয়া করেন যে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে এমন প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা দান করেন যা এই সভার সমস্ত বক্তব্যের উপর বিজয় লাভ করে। দোয়ার পর তিনি লেখেন যে, তাঁর মধ্যে যেন এক প্রকার শক্তি ফুৎকার করা হয়েছে এবং তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন যে এক ঐশী শক্তি তাঁর ভিতরকে তোলপাড় করে তুলছে। তিনি (আ.) সেই সময় অসুস্থতার কারণে শায়িত অবস্থাতেই একজন লিপিকারে সাহায্যে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন। তিনি (আ.) এত দ্রুত লিখছিলেন যে, লিপিকারের পক্ষে লেখা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রবন্ধ শেষ হওয়ার পর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম হয় 'মাযমুন বালা রাহা' অর্থাৎ প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট ছিল।

(হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ২৭৮-২৭৯)

এই ঐশী সুসংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি ২১ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সনে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন যার বিষয় ছিল " সত্য সন্ধানীদের জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ" এই ইশতোহারে তিনি (আ.) লিখেন: " প্রমূখ ধর্মসমূহের জলসা লাহোরের টাউন হলে ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৬ সনে অনুষ্ঠিত হবে। এই জলসায় এই অধমের পক্ষ থেকে কুরআন করীমের উৎকর্ষ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হবে। এই সেই প্রবন্ধ যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে এবং খোদার নিদর্শনবলীর মধ্যে একটি এবং এটি তাঁর সমর্থনে লেখা হয়েছে। এতে কুরআন করীমের ঐ সকল তত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যার দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটি খোদার বাণী এবং এটি বিশ্ব-প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি এই প্রবন্ধের আগাগোড়া পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর শুনবে, আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে এক নতুন ঈমান ও এক নতুন জ্যোতিঃ সৃষ্টি হবে এবং খোদা তা'লার পবিত্র গ্রন্থের এক পূর্ণাঙ্গীণ তফসীর সম্পর্কে সে জ্ঞাত হবে। আমার বক্তব্য মানুষের নিরর্থক বাগ্মিতা থেকে পবিত্র এবং যাবতীয় মিথ্যা আস্ফালন ও অহমিকার কলঙ্ক থেকে মুক্ত। আমি কেবল মানবীয় সহানুভুতির বশবর্তী হয়ে এই ইশতেহার লিখতে বাধ্য হচ্ছি যাতে আপনারা কুরআন শরীফের সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, কীভাবে বিরোধীরা অন্যায়পূর্ণভাবে অন্ধকারকে ভালবাসে এবং জ্যোতিঃকে ঘৃণা করে। সর্বজ্ঞ খোদা আমাকে ইলহাম দ্বারা অবগত করেছেন যে, এই প্রবন্ধটি সমস্ত প্রবন্ধের উপর বিজয় লাভ করবে এবং এর মধ্যে সত্য, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের এমন জ্যোতি আছে যা অন্যরা এখানে উপস্থিত থেকে আদ্যপ্রান্ত শুনলে লজ্জিত হবে। কি খৃষ্টান কি হিন্দু অথবা সনাতন ধর্ম বা আর্যধর্ম অথবা অন্য কেউ হোক না কেন, তারা নিজেদের গ্রন্থ থেকে এমন কৃচ্ছ সাধন কখনোই করে দেখাতে পারবে না। কেননা খোদা তা'লা মনঃস্থির করেছেন যে, সেইদিন এই পবিত্র গ্রন্থের অলৌকিক গুণাবলী প্রকাশ পাক। আমি কাশফে এই সম্পর্কে দেখেছি যে, আমার প্রসাদকে এক অদৃশ্যের হাত প্রভাবিত করেছে এবং তার স্পর্শে সেই প্রসাদ থেকে জ্যোতির কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার হাতেও এক প্রকার জ্যেতিঃ দেখা দিল তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একব্যক্তি উচ্চস্বরে বলে উঠল। 'আল্লাহু আকবার খারাবতা খায়বার' এর অর্থ হল এই প্রসাদটিকে আমার হৃদয় বোঝানো হয়েছে যা জ্যোতির প্রকাশ স্থল আর সেটি হল আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান এবং খায়বারের অর্থ হল সমস্ত অচল ধর্ম যেগুলির মধ্যে শিরক্ এবং মিথ্যার পঙ্কিলতা রয়েছে, এবং মানুষকে খোদার স্থান দেওয়া হয়েছে অথবা ঐশীগুণাবলীকে পূর্ণ মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। সুতরাং আমার উপর প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই প্রবন্ধটির ব্যপক প্রসারের পর মিথ্যা ধর্মসমূহের মিথ্যা উন্মোচিত হবে এবং কুরআনের শিক্ষা ক্রমশ পৃথিবীতে প্রসার লাভ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি নিজের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। অতঃপর এই কাশফের অবস্থাটিই ইলহামে রূপায়িত হয় এবং ইলহাম হয় 'ইন্নাল্লাহা মা'কা ইন্নাল্লা ইয়াকুমু আয়নামা কুমতা' অর্থাৎ খোদা তোমার সঙ্গে আছেন এবং তুমি যেখানে দাঁড়াও খোদাও সেখানে দাঁড়ান। ঐশী সমর্থনের জন্য এটি একটি রূপক ভাষা। আমি এখন বেশি লিখতে চাই না। প্রত্যেককে এই সংবাদ দিচ্ছি যে, প্রত্যেকে নিজের কষ্ট স্বীকার করে হলেও এই ঐশী তত্ত্বজ্ঞান শোনার জন্য লাহোরের জলসার দিনে অবশ্যই উপস্থিত হন, এতে তাদের বুদ্ধি ও ঈমান অকল্পনীয়ভাবে সমৃদ্ধ হবে ।

খাকসার

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

(২১ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬)

(তবলীগে রিসালত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৭-৭৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ইশতেহার ব্যপকহারে প্রকাশিত হয় এবং ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যায়।

জলসার অনুষ্ঠানের সূচনা

২৬ শে ডিসেম্বর ১৮৯৬ সালে, ১০ টার সময় আঞ্জুমান হিমায়তের ইসলাম হাইস্কুল স্থিত শেরা নোওয়ালা বিরাট প্রাঙ্গণে জলসা আরম্ভ হয়। হযরত আকদস (আ.)-এর প্রবন্ধ দ্বিতীয় দিন বেলা দেড়টায় দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত হয়। এই কারণে এর পূর্বে ঈশ্বরী প্রসাদ সাহেব মৌলবী আবু সাঈদ মহম্মদ হোসেন বাটালবী এবং বারোদ কুন্টা সাহেব এবং মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী, বাবু বেজারাম সাহেব এবং পণ্ডিত গোবর্ধন দাস সাহেবের বক্তব্য হয়। সেই সময় মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর খুব খ্যাতি ছিল এবং মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী সাহেবও যুবক ছিলেন এবং সদ্য জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মহম্মদ হোসেন বাটালবীর বক্তব্য সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর বক্তব্যের ধারে কাছেও আসতে পারে নি।

(তরিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬১)

হযরত আকদস (আ.)-এর প্রবন্ধের প্রতি শ্রোতাদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ

যেরূপ বলা হয়েছে যে, হযরত আকদস (আ.) -এর প্রবন্ধের জন্য দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন নির্ধারিত ছিল, কিন্তু বিরোধীতা সত্বেও জনমানসে এমন এক প্রেরণার সঞ্চার হয় যে প্রথম অধিবেশনের শ্রোতাবর্গ নিজেদের স্থান থেকে নড়ে নি বরং আরও হাজার হাজার শ্রোতার ঢল নামে। ফলে জলসার অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই প্যান্ডেল কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ডাক্তার, উকিল সহ দেশের বড় বড় সম্মানীয় নেতৃবৃন্দ ও বিত্তবান লোকেরাও দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। অবশেষে হযরত আব্দুল করীম সাহেব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে এবং সুললিত কণ্ঠে হযরত আকদস (আ.)-এর প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করেন। ঐশী সাহায্য ও সমর্থনে রচিত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ এবং মৌলানা আব্দুল করীম সাহেবের সুমিষ্ট কণ্ঠ হাজার হাজার শ্রোতাকে এমন বিমোহিত করে তোলে যে ভারতভূমিতে এমন দৃশ্য আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি। এমন প্রতীত হচ্ছিল যেন উর্দ্ধলোক থেকে ফিরিশতারা জ্যোতির সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং এক অদৃশ্য হাত নিজের আকর্ষণীয় শক্তি দ্বারা প্রত্যেকটি হৃদয়কে সম্মোহনের জগতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মন ও প্রাণ সেই অলৌকিক ভাণ্ডারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। অকস্মাৎ বক্তব্যের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল। তা দেখে মৌলবী আবু ইউসুফ মুবারক আলি সাহেব সিয়ালকুটি সাহেব ঘোষণা করেন যে, আমি নিজের সময়টুকু হযরত আকদস (আ.)-এর প্রবন্ধের জন্য উৎসর্গ করলাম। এই ঘোষণায় উপস্থিত শ্রোতার মধ্যে খুশির ঢেউ বয়ে আনে। প্যান্ডেল করতালির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। অতঃপর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মনিমানিক্য বিতরিত হতে থাকে। প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকতেই সময় আবার শেষ হয়ে গেল। এবার চারিদিকে হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে যায় যে, জলসা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকুক যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত না হয়। জলসার ব্যবস্থাপকগণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। শ্রোতাগণ এই ঘোষণা শুনে আবারও করতালি দিয়ে নিজেদের উচ্ছাস প্রকাশ করেন। সমস্ত প্রবন্ধটি আদ্যপ্রান্ত সমান উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে শোনা হল এবং সন্ধ্যার সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চার ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। শ্রোতারা এমন আত্মহারা ও বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা মনে করে বসে যে পাঁচটি প্রশ্নেরই উত্তর পাঠ করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মৌলান আব্দুল করীম সাহেব উচ্চকণ্ঠে বলেন যে, শ্রোতৃবর্গ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যা কিছু শুনলেন তা কেবল একটি প্রশ্নের উত্তর ছিল। এখনও চারটি প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে। মৌলবী সাহেবের একথা শোনা মাত্রই শ্রোতারা একবাক্যে সুউচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠেন যে, চারটি প্রশ্নের উত্তর যখন বাকি আছে তখন সময় কেন বাড়ানো হবে না। চতুর্দিক থেকে এই জোরালো দাবি জলসার ব্যবস্থাপকদেরকে ঘোষণা করতে বাধ্য করে যে, কেবল শ্রোতাদের অনুরোধে জলসার জন্য একটি দিন বাড়ানো হচ্ছে। এই ঘোষণার ফলে জনগণের মধ্যে যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬২)

জলসার ব্যবস্থাপকদের বিবৃতি

২৭ শে ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জলসার ব্যবস্থাপকগণ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করা হল:

" পণ্ডিত গোবর্ধন দাস সাহেবের বক্তৃতার পর আধ-ঘন্টার বিরতি ছিল। কিন্তু, বিরতির পর যেহেতু ইসলামের একজন প্রখ্যাত প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বক্তব্য নির্ধারিত ছিল এই কারণে অধিকাংশ শ্রোতারা নিজেদের জায়গা থেকে নড়ে নি। দেড়টা বাজতে তখনো অনেক সময় বাকি ছিল, কিন্তু তখনই ইসলামীয়া কলেজের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ দ্রুত পূর্ণ হতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা মাঠ পূর্ণ হয়ে যায়। সেই সময় গোটা মাঠে প্রায় ৭/৮ হাজার মানুষের সমাবেশ ছিল। বিভিন্ন ধর্ম, জাতি এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরাও উপস্থিত ছিলেন। যদিও কুরসী, টেবিল এবং নীচে পর্যাপ্ত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু শত শত মানুষের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। সেই সকল দাঁড়িয়ে থাকা শ্রোতাদের মধ্যে পাঞ্জাবের বড় বড় নেতা ও আলেমবর্গ, ব্যারিস্টার, উকিল, প্রফেসর এবং ডাক্তার মোটকথা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সঙ্গে অবিরাম পাঁচ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা প্রমাণ করে যে, এই পবিত্র 'তাহরীক' -এর প্রতি ঐ সকল মর্যাদাসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে কি প্রকারের সহানুভুতি ছিল। প্রবন্ধ রচয়িতা যদিও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি স্বয়ং নিজের এক বিশেষ শিষ্য জনাব মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী সাহেবকে প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। প্রবন্ধটির জন্য যদিও কমিটির পক্ষ থেকে দুই ঘন্টা নির্ধারিত ছিল, কিন্তু শ্রোতারা এই প্রবন্ধটির উপর এমন আগ্রহ ও রুচি প্রকাশ করেন যে, পরিচালক মহাশয় অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সাথে এবিষয়ের অনুমতি প্রদান করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রবন্ধটি শেষ না হয় এই জলসা অব্যাহত থাকবে। তাঁর এমন ঘোষণা জলসার ব্যবস্থাপক ও শ্রোতাবর্গের ইচ্ছানুরূপই ছিল। কেননা, যখন নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মৌলবী আবু ইউসুফ মুবারক আলি সাহেব নিজের জন্য নির্ধারিত উক্ত প্রবন্ধটি শেষ হওয়া পর্যন্ত দিয়ে দিলেন, তখন উপস্থিতবর্গ এবং পরিচালক মহাশয় উল্লাস ধ্বনি দিয়ে মৌলবী সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। জলসার সময় সাড়ে চারটা পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু জনসাধারণের মনঃস্কামনা অনুধাবন করে জলসা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হয়। কেননা, প্রবন্ধটি পাঠ করা চার ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আদ্যপ্রান্ত জনসাধারণের মধ্যে সমান আগ্রহ ও গ্রহণীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

(রিপোর্ট জলসা মাযাহেব আলম, পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০)

যদিও এই প্রবন্ধটি শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে আসে কিন্তু তখনও কেবল প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়েছিল। এই প্রবন্ধটির উপর সমস্ত শ্রোতাদের মধ্যে এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয় যে, জনসাধারণ জলসার সঞ্চালককে জলসার চতুর্থ অধিবেশনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানায় যাতে অবশিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর শোনানো যায়। কেননা, এক্সিকিউটিভদের ঘোষণা অনুসারে জলসার জন্য কেবল তিন দিনই নির্ধারিত ছিল এবং তৃতীয় অধিবেশনের জন্য বক্তা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। জলসার সঞ্চালক মহাশয়গণের বিশেষ সম্মতিতে জলসার দিন বাড়ানো হয়েছিল।

(রিপোর্ট জলসা মাযাহেব আলম, পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০)

২৯ শে ডিসেম্বর হযরত আকদস (আ.)-এর প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশের প্রভাব

২৯ শে ডিসেম্বর জলসার শেষ দিন ছিল। এই দিন যদিও জলসার কর্মকাণ্ড প্রথা ভেঙ্গে ৯ টার সময় শুরু হয়েছিল। কিন্তু ৯টা বাজার পূর্বেই শ্রোতাদের ঢল নামে। নির্ধারিত সময়ে মৌলানা আব্দুল করীম সাহেব হযরত আকদস (আ.)-এর তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ প্রবন্ধের শেষাংশ পাঠ করা আরম্ভ করেন। সেই ২৭ শে ডিসেম্বরের মতোই পরিবেশ সৃষ্টি হল। প্রত্যেকে

বিভোর হয়ে শুনছিল। প্রবন্ধের এই শেষাংশের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, জলসায় অ-মুসলিম বক্তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামী শিক্ষা ও কুরআনের সত্যতার উপর যে সমস্ত আপত্তি তোলা হয়েছিল এতে সেগুলির সুস্পষ্ট উত্তর ছিল। বরং মুসলমানদের পক্ষ থেকেও কিছু প্রতিনিধি ইসলামের পবিত্র ছবির উপর যে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছিল এর মাধ্যমে সেগুলিও খণ্ডন করা হয়। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী একদিন পূর্বে নিজের বক্তব্যে ইসলামের মত জীবিত ধর্মকে 'মোজোয'-শূন্য হওয়া অপবাদ দেয়। প্রবন্ধের এই অংশের সেই যুক্তিকেও খণ্ডণ করা হয় যা শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করে তোলে। অধিকাংশ মানুষ অঝোরে কেঁদে চলেছিল এবং তাদের মন ও প্রাণ আনন্দে ভরে উঠেছিল। হযরত আকদস লিখেন- " মানবজাতির প্রতি এটি আমার অন্যায় হবে যদি আমি সেই ইসলামে সেই মর্যাদার কথা প্রকাশ না করি যার আমি প্রশংসা করেছি এবং সেই ঐশী কথোপকথনের সেই মর্যাদা যা সম্পর্কে আমি এখানে বিশদে বর্ণনা করেছি সেগুলি খোদার কৃপা দ্বারা আমি প্রাপ্ত হয়েছি যাতে আমি দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিই এবং পথভ্রষ্টদেরকে হারিয়ে যাওয়া পথের সন্ধান দিই এবং সত্য গ্রহণকারীদেরকে এই পবিত্র ঝর্ণার সুসংবাদ দিই যার উল্লেখ অনেক স্থান আছে কিন্তু অর্জনকারীর সংখ্যা নগণ্য। আমি শ্রোতাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, যা অর্জন করলে মানুষ নাজাত ও স্থায়ী আনন্দ লাভ করে তা কুরআন শরীফের অনুবর্তিতা ব্যতিরেক কখনোই সম্ভব নয়। কতই না উত্তম হত যদি মানুষ সেই জিনিস দেখত যা আমি দেখেছি, আমি যা কিছু শুনেছি সেই সব শুনত এবং কেচ্ছা-কাহিনী বর্জন করে সত্যের পথে ধাবিত হত। "

" আমি প্রত্যেক সত্যেন্বেষীকে আশ্বস্ত করছি যে, কেবল ইসলামই এই পথের সুসংবাদ দেয়। অন্যান্য জাতিরা তো খোদার ইলহামের পথ দীর্ঘকাল যাবৎ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। অতএব নিশ্চিত জেনো রেখো! এটি খোদার পক্ষ থেকে কোন বাধা নয় বরং দুর্ভাগ্যের কারণে মানুষ এমন মিথ্যা বাহানা তৈরী করে নেয়। যেভাবে চোখ ছাড়া আমাদের জন্য দেখা সম্ভব নয়, বা জিহ্বা ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে কুরআন ছাড়া আমাদের প্রিয়খোদার চেহারা দর্শন করাও সম্ভব নয়। আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হয়েছি, এমন কাউকে পাই নি যে এই পবিত্র ঝর্ণা ছাড়া এই প্রকাশ্য তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে। "

(রিপোর্ট জলসা আযাম মাযাহেব, পৃষ্ঠা: ২০৩)

পুণরায় বক্তব্য চলাকালীনই নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হল। শ্রোতা এবং সদর সাহেবগণ উভয়ের অনুরোধেই পুনরায় সময় বাড়ানোর দাবি তোলা হয়। জলসার সঞ্চালক কমিটি এই অনুরোধ স্বীকার করে হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করেন।

(রিপোর্ট জলসা আযাম মাযাহেব, পৃষ্ঠা: ১১)

প্রবন্ধ সবার উপর জয়ী হল

মোট কথা এই প্রবন্ধটি পূর্ণ মর্যাদার সহকারে সমাপ্ত হয়। সকলে মুসলমানদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছিল এবং এই প্রবন্ধটি ইসলামের বিজয়ের কারণ হল। সমগ্র দেশে এই প্রবন্ধটির আলোড়ন সৃষ্টি করে, সর্বত্র এর সম্পর্কেই আলোচনা হচ্ছিল। মুসলমানরা আনন্দে বলে উঠছিল যদি আজকে এই প্রবন্ধটি না হত তবে ইসলামে শেষকৃত্য সম্পন্ন হত। প্রত্যেকে বলছিল, আজ ইসলামের বিজয় হয়েছে। এবং প্রবন্ধটি সবার উপর জয়যুক্ত হয়েছে। (পরিশিষ্ট আঞ্জামে আথম, পৃষ্ঠা: ৩২) ইসলামের এই অসাধারণ বিজয় স্বীকার করে প্রায় কুড়িটি পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় সংবাদ প্রকাশ করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।পত্রিকাগুলিতে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে প্রবন্ধটির প্রশংসা করা হয়। পত্রিকাগুলি হল-সিভিল এন্ড মিলিটারী গ্যাজেট, পেসা আখবার, চোধর্বী সদী, সিরাজুর আখবার, মাশীরে হিন্দ। সাদিকুল আখবার, মুখবির দকিন, ওজীরে হিন্দ এবং জেনারেল ও গোহর আসফী (কোলকাতা)।

(হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ২৭৯)

সিভিল এন্ড মিলিটারী গ্যাজেট এবং অবযার্ভর-এর রিভিউ সিভিল এন্ড মিলিটারী গ্যাজেট (লাহোর) লেখে:

এই জলসায় শ্রোতারা মির্যা সাহেবের বক্তব্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও রুচি প্রকাশ করছিল যেটি ইসলামে সমর্থন ও সুরক্ষার জন্য পূর্ণ দক্ষ। এই লেকচারটি শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ঢল নেমেছিল। আর যেহেতু মির্যা সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারেন নি এই কারণে তাঁর নিজের এক শিষ্য মুন্শী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব এই প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান। ২৭ তারিখ এই লেকচার তিন ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে এবং জনসাধারণ সাগ্রহে ও মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকেন। কিন্তু তখনও কেবল একটি প্রশ্নের উত্তরই দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি সময় দেওয়া হয় তবে অবশিষ্টাংশও শোনানো হবে। এই কারণে ব্যবস্থাপকগণ ও সদর সাহেব ২৯ শে ডিসেম্বরের দিন বাড়ানোর প্রস্তাব স্বীকার করে নেন। পাঞ্জাব অবযার্ভার পত্রিকাও অনুরূপ ভাষায় হযরত আকদস (আ.)-এর প্রবন্ধের রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

(পরিশিষ্ট আঞ্জাম আথম, পৃষ্ঠা: ৩২)

রাওয়াল পিণ্ডি পত্রিকা লেখে: " সমস্ত লেকচারগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বক্তব্য যেটি জলসার প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটি হল মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের বক্তব্য। প্রখ্যাত আলেম ও সুবক্তা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে পাঠ করেন। এই বক্তব্য দুই দিনে সমাপ্ত হয়। ২৭ শে ডিসেম্বর প্রায় চার ঘন্টা এবং ২৯ শে ডিসেম্বর প্রায় দুই ঘন্টা পর্যন্ত জারি থাকে। মোট ৬ ঘন্টায় এই লেকচার সমাপ্ত হয় যা এবং প্রবন্ধটি প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট ছিল।

মোট কথা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব এই বক্তব্য শুরু করেন এবং সমস্ত শ্রোতা মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকেন। প্রত্যেকটি কথা ও বাক্যে প্রশংসা ও স্তুতিসূচক ধ্বনি মুখরিত হচ্ছিল। এবং অনেক সময় একই বাক্যের পুনরাবৃত্তির জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল। আজীবন আমাদের এমন প্রীতকর বক্তব্য কর্ণগোচর হয় নি। অন্যান্য ধর্মের পক্ষ থেকে যতজন বক্তা বক্তব্য রেখেছিলেন তারা তো পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নগুলির উত্তর পর্যন্ত দেয় নি। বক্তারা সাধারণত চতুর্থ প্রশ্ন পর্যন্তই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং বাকী প্রশ্নগুলিকে খুব কম স্পর্শ করেছেন। অধিকাংশ বক্তা এমনও ছিলেন যারা অনেক কিছুই বলতেন কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি কথাই প্রাঞ্জল ছিল। বক্তব্যগুলি সাধারণত অগভীর চিন্তাধারা বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু মির্যা সাহেবের বক্তব্য প্রশ্নগুলির পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গীণ উত্তর দিয়েছিল। শ্রোতারা যেটিকে অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং অমূল্য ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান করেন। আমরা মির্যা সাহেবর ভক্ত নই, আর তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কও নেই, কিন্তু আমরা কখনো ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিতে পারি না আর না কোন সুস্থ বিবেকবান ও উত্তম চরিত্রের মানুষ এটি সহন

করতে পারে। মির্যা সাহেব সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কুরআন মজীদ থেকে প্রদান করেছেন (যেরূপ শর্ত ছিল) এবং ইসলামের সমস্ত প্রমূখ নীতিকে যৌক্তিক দলিল ও শাস্ত্রগত প্রমাণ উপস্থাপন করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পর ঐশী বাণীকে উদ্ধৃত করেন। এই পন্থা বিচিত্র মর্যাদা প্রকাশ করে। মির্যা সাহেব কেবল কুরআনের দর্শনই বর্ণনা করেন নি বরং তিনি কুরআন শরীফের শব্দতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব উভয় বর্ণনা করেছেন। মোটকথা মির্যা সাহেবের বক্তব্য সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গীন প্রবন্ধ ছিল যা অগণিত তত্ত্বজ্ঞান, সত্য, প্রজ্ঞা ও গোপন রহস্যাবৃত মুক্তার সমন্বয় ছিল। এই প্রবন্ধে ঐশী দর্শনকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল যে সমস্ত ধর্মের মানুষ তা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। কোন ব্যক্তির ভাষণের সময় এত মানুষ একত্রিত হয় নি মির্যা সাহেবের বক্তব্যের সময় যেমনটি হয়েছিল। গোটা হল কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। শ্রোতারা বিমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। মির্যা সাহেবের বক্তব্য এবং অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে,মির্যা সাহেবের বক্তব্যের সময় জনগণ মৌমাছির ন্যায় উপচে পড়ছিল। কিন্তু অন্যান্য বক্তাদের বেলায় ভাষণ চলাকালীন অমনোযোগের কারণে অনেকে উঠে যাচ্ছিলেন। মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণ মানের ছিল। উপরন্ত সেটি ছিল প্রচলিত চিন্তাধারা বিশিষ্ট যা আমরা সচরাচর প্রায়ই শুনে থাকি। এর মধ্যে কোন বিচিত্র বিষয় ছিল না এবং তাঁর বক্তব্যের সময় অনেকে এসে বসা মাত্রই উঠে চলে যাচ্ছিল। মহাশয়কে নিজের বক্তব্য শেষ করার জন্য কয়েক মিনিট বেশি বলার অনুমতিও ছিল না। কিন্তু মির্যা সাহেবের বক্তব্য শেষ করার জন্য লালা দূর্গা প্রসাদ মহাশয় নিজে থেকেই দশ পনেরো মিনিট সময় বাড়িয়ে দেন। মোট কথা এই বক্তব্য এমন তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ ও অসাধারণ ছিল নিজে শোনা ছাড়া এর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মির্যা সাহেব মানুষের সৃষ্টি থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এমন পর্যায়ক্রমে নিজের বক্তব্যের বিষয়বস্ত বর্ণনা করেন এবং 'আলামে বারযাখ' ও কিয়ামত দিবস-এর দৃশ্য এমনভাবে তুলে ধরেন যে বেহেশত ও দোযখের রূপ উন্মোচন করে দেন। ইসলামের ঘোর শত্রুও সেদিন এই বক্তব্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। যেহেতু এই বক্তব্যটি অতি সত্বর রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হবে এই কারণে আমরা পাঠকবর্গকে প্রতীক্ষার জন্য উৎসাহিত করব। মুসলমানদের মধ্যে মৌলবী সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেবের বক্তব্যও কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্য অনেকটা উপদেশবাণীর মতো শোনাচ্ছিল। এর মধ্যে সেই দার্শনিক তত্ত্বের অভাব বোধ হচ্ছিল যা এই জলসার জন্য আবশ্যক ছিল। .....যাই হোক আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, এই জলসায় ইসলাম প্রাধান্য লাভ করে এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের উপর ইসলাম প্রভাব বিস্তার করে, কেউ মুখে স্বীকার করুক বা না করুক। (চৌধবী সাদী, ১ লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭)

মোট কথা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করে এবং ইসলাম বিজয় লাভ করে। এই মোকাবেলা সেই মোকাবেলা সদৃশ ছিল যা হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদের সঙ্গে করতে হয়েছিল। সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের লাঠির কল্পিত সাপ তৈরী করে রেখেছিল। কিন্তু যখন খোদা তা'লা মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে একটি পবিত্র ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তব্য হিসেবে ইসলামের সত্যতার লাঠি তুলে দিলেন তখন সেটি অজগর সাপ হয়ে সকলকে গিলে ফেলল।

জেনারেল ও গোহর আসফীর মন্তব্য

বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জ্ঞাত হয়েছি যে, জলসার কর্মীরা বিশেষ করে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এবং স্যার সৈয়্যদ আহমদ সাহেবকে জলসায় অংশ গ্রহণের জণ্য পত্র লিখেছিলেন। যদিও মির্যা সাহেব শারিরিক অসুস্থতার কারণে সশরীরে জলসায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু নিজের প্রবন্ধ পাঠিয়ে তাঁরই শিষ্য মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেবকে বক্তব্য পঠনের জন্য নির্ধারিত করেন। কিন্তু স্যার সৈয়্যদ আহমদ জলসায় অংশ গ্রহণ করা অথবা প্রবন্ধ পাঠানো থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এই কারণে নয় যে তিনি বয়োঃবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং এই প্রকারের জলসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য তার শারীরিকভাবে অসমর্থ ছিলেন, এই কারণেও না যে সেই সময় মেরঠে শিক্ষা সম্মেলন নির্ধারিত হয়েছিল। বরং এই কারণে যে, তাঁর নিকট ধর্মীয় জলসাসমূহ মনোযোগ আকর্ষণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। কেননা, তিনি নিজের চিঠিতে, যা আমরা পরবর্তীতে এই পত্রিকায় প্রকাশ করব, সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, তিনি কোন উপদেশ দানকারী কোন মৌলভী নন। এটি মৌলভীদের কাজ। জলসার অনুষ্ঠান দেখে এবং তদন্ত করে আমরা অবগত হয়েছি যে, জনাব মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব কানপুরী, জনাব মৌলবী আব্দুল হক সাহেব দেহেলবী এবং জনাব মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী এই জলসার প্রতি কোন বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নি। আর না আমাদের মৌলবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কোন যোগ্য ব্যক্তি নিজের প্রবন্ধ পাঠ করা বা করানোর প্রযত্ন করেছেন। দুই একজন আলেম অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এই ময়দানে পদার্পণ করেছিলেন, কিন্তু তারাও এই কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদন করে নি। তারা নির্ধারিত বিষয়ের উপর কোন কথাই বলে নি কিম্বা নিতান্ত অগোছালোভাবে কিছু না কিছু বলে চলে গেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী রিপোর্টে আলোকপাত করা হবে। মোট কথা জলসার কার্য বিবরণী থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, একমাত্র মাত্র কাদিয়ানের হযরত মির্যা সাহেবই ছিলেন যিনি মোকাবেলার ময়দানে ইসলামের যোদ্ধা হওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নির্বাচনকে সঠিক প্রমাণ করতে পেশাওয়ার, রাওয়ালপিন্ডি, ঝিলম, শাহপুর, ভেরা, খুশাব, সিয়ালকোট, জম্মু, ওজীরাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, গুরদাসপুর, লুধিয়ানা, শিমলা, দিল্লী, আম্বালা, পাটিয়ালা, কপুরথলা, দেরাদুন,মাদ্রাস, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ, বেঙ্গালোর ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন শহরের ইসলামী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ওকালত নামার মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হয়ে আসে। বস্তুতঃ এই জলসায় যদি হযরত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ না থাকত তবে মুসলমানদেরকে অন্যান্য ধর্মের পক্ষ থেকে যারপরনায় লাঞ্ছনা ও অপদস্ততা সহন করতে হত। কিন্তু খোদার শক্তিশালী হাত পবিত্র ইসলামকে পতন থেকে রক্ষা করেছে। বরং এই প্রবন্ধের দরুন এমন বিজয় লাভ হয়েছে যে সমর্থকরা থেকে শুরু করে বিরোধীরা পর্যন্ত অকৃত্রিম উদ্দীপনা সহকারে স্বীকার করেছে যে, এই প্রবন্ধটি বাকী প্রবন্ধগুলির উর্দ্ধে ছিল। শুধু এতটুকুই নয় বরং প্রবন্ধ শেষ হওয়ার পর বিরোধীদের মুখ থেকে সত্য কথা এভাবে বেরিয়ে এল যে, এখন ইসলামে সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে এবং ইসলামের বিজয় লাভ হয়েছে। যে নির্বাচন লক্ষ্যবাণের ন্যায় সঠিক প্রমাণিত হল এখন তার বিরোধীতার কোনও সুযোগই

নেই। বরং এখন এটি আমাদের জন্য গর্বের কারণ, এর মধ্যে ইসলামের মর্যাদা নিহিত আছে এবং এরই মধ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা রয়েছে। যদিও ভারতে প্রমুখ ধর্মসমূহের এটি দ্বিতীয় সম্মেলন ছিল, কিন্তু এটি নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে সমগ্র ভারতের নগরকে পরাস্ত করেছে। ভারতের বিভিন্ন শহরের নেতৃত্ববৃন্দ এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেন এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একথা ব্যক্ত করতে চাই যে, আমাদের মাদ্রাসও এতে অংশ গ্রহণ করেছে। জলসার জনপ্রিয়তা এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, ইশতেহারে নির্ধারিত তিন দিনের সময়কে একদিন বাড়াতে হয়। জলসার আয়োজনের জন্য জলসা কমিটি লাহোরের সবথেকে প্রশস্ত অট্টালিকা ইসলামিয়া কলেজের প্রস্তাব করে। কিন্তু কিন্তুর খোদার মহিমা দেখুন সেই অট্টালিকা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। এটি জলসার মহত্বের একটি যথেষ্ট প্রমাণ যে, সমগ্র পাঞ্জাবের প্রমূখ নেতাগণ ছাড়াও চিফ কোর্ট এবং হাইকোর্ট, এলাহাবাদ-এর সম্মানীয় জজ বাবু প্রতূল চন্দ্র সাহেব এবং ম্যাজিস্ট্রেট ব্যানার্জি সাহেব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেন।

বক্তব্যটির ভিন্ন ভাষায় অনুদিত হওয়া এবং এবং এর বিশ্বব্যাপী গ্রহণীয়তা

১৮৯৭ সালে প্রথম বার এই কালজয়ী বক্তব্য পুস্তক আকারে উর্দু ভাষায় প্রকাশ পায়। শীঘ্রই এটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানে দুনিয়ার প্রমূখ ভাষাসমূহে যেমন- আরবী, ফার্সী, ইংরেজি, জার্মানী, ইন্ডোনেশিয়ান, স্পেনিশ, বার্মি, চিনি, সিংহলী ছাড়াও কান্নাড়, হিন্দি, গুরুমুখী ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে কাশফে বলা হয়েছিল। এটি পৃথিবী ব্যপি ইসলামে প্রচার ও প্রসারেরর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশসমূহে ইসলামী শিক্ষার বিস্তৃতি এবং গ্রহণীয়তার ক্ষেত্রে এই লেকচারের গুরুত্ব অপরিসীম। শত শত অ-মুসলিম এই পুস্তকটি অধ্যায়ন করে ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। একটি বিরাট শ্রেণীর মানুষ এর পবিত্র জ্যোতির মাধ্যমে সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলেছে। 'ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী' নামে এই পুস্তকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন জনাব মহম্মদ আলি সাহেব এম.এ.। এই অনুবাদ ১৯১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল।

'ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী' পশ্চিমা চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে।

আমেরিকা এবং ইউরোপে যখন 'ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী' -এর অনুবাদ প্রকাশ পায় তখন সেটি খুবই জনপ্রিয় ও গ্রহণীয় হয়। পশ্চিমা চিন্তাবিদরা এই লেকচারটির ভূয়সী প্রসংশা করেন। কয়েকটি মন্তব্য উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা হল।

(১) খ্যাতনামা রুশী চিন্তাবিদ একাউন্ট টালস্টাই বলেন- ***The ideas are very profound and very true.***

(এই চিন্তাধারা অত্যন্ত গভীর ও সত্য)

(২) থিয়োসোফিকাল বুক নোটস' লেখে-

Admirably calculated to appeal to hte student of comparative religion, who will find exactly what he wants to know as Mohammedan doctrines on souls and bodies, divine existence, mortal law and much else.
Theosophical Book Notes. (March 1912)

প্রশংসনীয়ভাবে বিবেচিত যা ধর্ম তুলনাকারী এমন ছাত্রদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে যারা এর মধ্যে সেই সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে যা তারা মহম্মদী বিধি-আইনের আলোকে আত্মা, শরীর, আধ্যাত্মিক জীবন, নৈতিকতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক।

(৩) দ্যা ইংলিশ মেল মতামত প্রকাশ করে লিখে-

A summary of really Islamic ideas.
The English Mail. 27 th Oct, 1911

প্রকৃত ইসলামী চিন্তাধারার সারাংশ

(৪) দ্যা ব্রিস্টল টাইমস এন্ড মিরর মন্তব্য করে লেখে-

Clearly it is no ordinary person who thus address himself to the West.
The Bristol Times and Mirror

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি পশ্চিমা বিশ্বকে এইভবে সম্বোধন করে সে কোন সাধারণ ব্যক্তি নয়।

(৫) দ্যা ডেলি নিউজ, (শিকাগো) লেখে-

The devout and earnest Character of the author is apparent.
Chicago, 16 March, 1912
(The Daily News)

একনিষ্ঠ ও সত্য ভিত্তিক এই লেখকের চরিত্র দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

(৬) দ্যা এঙ্গলো বেলজিয়ান টাইমস (ব্রাসেলস) পুস্তকের উপর মন্তব্য করে-

The teachings of Islam turns out a worndderfull commentary on the Quran (the Muslim Scripture) itself. The author's method has a further moral, and this is one which, to our mind, all writers on religion wil do well to consider. it is that a religious treatiese should be affirmative rather than negetive in character. It should insist on he beauties of one system rather than on defects of another. The teachings of islam demonstrates the principle in a pre-eminent degree. and the result is that the author has been able , without being in the least bitter towards anay non-muslim system, guide the reader to an appreciation of Muslim fundamentals such as would have been impossible otherwise. The book rings with sincerity and conviction.
The Anglo-Belgion Times
Brussels

'টিচিংস অব ইসলাম' মুসলমানদের ঐশী গ্রন্থ কুরআন করীমের একটি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। লেখকের বর্ণনা ভঙ্গি আরও একটি নৈতিক মান স্থাপন করছে, আমাদের মতে ধর্মীয় বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাকারী সকল লেখকদের সেটি দৃষ্টিপটে রাখা বাঞ্ছনীয়। সেটি হল এই যে, সর্বদা একজন ধর্ম বিষয়ক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক না হয়ে সদর্থক বা ইতিবাচক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তার উচিত কোন ব্যবস্থাপনার উন্নত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী তুলে ধরা, কেবল অপরের ত্রুটি খুঁজে বের করা নয়। 'টিচিংস অব ইসলাম' অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে এই নীতিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে নীতির ভিত্তিতে লেখক পাঠকবর্গকে ইসলামের মৌলিক নীতি সম্পর্কে পরিচিতি হওয়ার জন্য অন্য কোন ধর্মের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে নি। আর এবিষয়টি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করলে অর্জন করা সম্ভব হত না। মোট কথা এই পুস্তকটি নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের এক পূর্ণ বৃত্ত।

(সিলসিলা আহমদীয়া)

সুধী পাঠকবর্গ! সমস্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, এই জলসা ঐশী ইচ্ছা অনুসারেই আয়োজিত হয়েছিল যাতে খোদা তা'লা ইসলামের সৌন্দর্য্যকে জগতের সম্মুখে প্রকাশ করে দেন এবং সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। এক্ষেত্রে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের বিজয়ী সেনাপতি রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

****

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহান কীর্তি

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মওউদ (রা.)

হুযুর (রা.) সুরা আলে ইমরানের ১৯১-১৯৬ আয়াত পাঠ করেন এবং বলেন আমি যে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে সেই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যা আমি আজকের বক্তব্যে উপস্থাপন করতে চাই।

এই বিষয়টি জামাতের সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখে যাকে জীবন-মরণের প্রশ্ন বলা যেতে পারে। আমি যেভাবে এই বিষয়টিকে জামাতের মানুষদের মন ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করাতে চাইছি, যদি তারা সেই ভাবেই আত্মস্থ করে ফেলে তবে তবলীগের পথ অনেক সহজ হবে। ইনশাল্লাহ্ ।

আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি এবং অবশেশে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সত্যকে যদি জগতের সামনে খণ্ড-খণ্ড আকারে উপস্থাপন করা হয় তবে তা সেরকম ভাবে কার্যকরী হতে পারে না সামগ্রিকরূপে উপস্থাপন করলে যে পরিণাম পাওয়া যায়। দেখ, কোন সুদর্শন মানব বা মানবীর নাক যদি কেটে নিয়ে মানুষকে দেখিয়ে বলা হয় দেখ যে, কত সুন্দর নাক! তবে কেই তার সৌন্দর্য্যে মোহিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন সুদর্শন ব্যক্তির কান কেটে নিয়ে মানুষকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, দেখ, কত সুন্দর কান! তবে তার সৌন্দর্য্য তাদেরকে কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না। হ্যাঁ, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত হয়ে যখন শরীররূপে সামনে আসে তখন মনের উপর প্রভাব ফেলে। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর দাবী সম্পর্কে আমাদেরকেও সামগ্রিকরূপে বিবেচনা করতে হবে। অতঃপর দেখা উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা"লার পক্ষ থেকে প্রমাণিত হন কিনা।

পরিতাপের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, জামাত এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কীর্তিকে গভীরভাবে দেখা হয় নি। আমি মানুষকে কতবার শুনেছি একথা বলতে যে, বল তো মির্যা সাহেবের আগমণের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল?

এই প্রশ্ন যখন করা হয় যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কি কি কাজ করেছেন? তখন অনেক সময় প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য থাকে কোন মোক্ষম বস্তু হাতে পাওয়া। সে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণের সন্ধানে থাকে যা আধ্যাত্মিত জগতে পাওয়া সম্ভব নয়, কেবল বস্তুজগতের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। অথবা মানুষ সময়ের পূর্বেই পরিণাম বা গন্তব্যে পৌঁছে এমন চেষ্টা করে।

কোন কাজের জন্য যে সময় নির্ধারিত থাকে তার পূর্বে ফলাফল জানতে চাওয়া অনুচিত। বস্তুতঃ এই ধরণের প্রশ্নকর্তারা সাধারণত দু'টি ভুল করে থাকে। এক, তারা যা প্রশ্ন করে তার উত্তর তারা বস্তুজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাশা করে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা বলে, বল তো মুসলমানদের রাজত্ব কোথায় কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? অথবা জিজ্ঞাসা করে যে, কতজন কাফেরকে হত্যা করেছে? কতজন অ-মুসলিম রাজ্যকে পরাস্ত করেছে? মোটকথা, হয় তারা স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা মৃতদেহের স্তুপ দেখতে চায়। দ্বিতীয় যে ভুল তারা করে তা হল, তারা অসময়ে পরিণামের সন্ধান করে।

ঐ সকল মানুষ যারা এই প্রশ্ন করে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কি কাজ করেছে যে তাকে মান্য করা এতই আবশ্যক বলে মেনে নিতে হবে। তাদেরকে আমি বলতে চাই যে, কেবল হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রত্যাদিষ্ট ও খোদার প্রেরিত পুরুষ নন। তাঁর পূর্বে হাজার হাজার নবী গত হয়েছেন যাদের উল্লেখ কুরআন শরীফে এবং অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থে বিদ্যমান। প্রায় দুই ডর্জন নবীর উল্লেখ কুরআন মজীদেও এসেছে। যাদের মধ্যে দুই-তিন জন ব্যতিরেকে কারোর উপর শরীয়ত অবতীর্ণ হয় নি।

সমস্ত নবীর জীবনীর উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নবীগণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক প্রভাব পৃথিবীতে রেখে যান যা জাগতিকদৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব নয়। তবে যুক্তিগত দিক থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব যে নবী এমন এক বস্তু রেখে গেছেন যা আযীমুশশান পরিণাম বয়ে আনতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, নবীদের উপমা সেই বৃষ্টির ন্যায় হয়ে থাকে যা দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর বর্ষিত হয়। বৃষ্টি না হওয়ার কারণে হাত-পা রুক্ষ হয়ে যায়, বৃক্ষরাজি শুষ্ক হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন বৃষ্টি নেমে আসে তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজে থেকেই কোমল হয়ে ওঠে । চতুর্দিকে সবুজের সমাহার দেখা দেয়। এবং আরও অনেক প্রকারের পরিবর্তন প্রকাশ পায়।

অতএব, অমুক নবী প্রারম্ভিক যুগে কি করেছে, এমন প্রশ্ন অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রকারের। মোমিনের কাজ হল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবিষয়ে বিবেচনা করা। যদি কোন ব্যক্তি একজন নবীকে এই কারণে ত্যাগ করে যে, সেই নবীর প্রারম্ভিক যুগে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজ তার নজরে পড়ে না এবং কোন বিরাট সাফল্য ও পরিবর্তন সে উপলব্ধি করতে পারে না, তবে তাকে সমস্ত নবীকেই ত্যাগ করতে হবে। কেন যদি তার এই মানদণ্ড সঠিক হয় পূর্ববর্তী নবীগণকেও তার যাচাই করা দরকার এবং তাদেরকেও ত্যাগ করা দরকার। কিন্তু মুসলমানেরা যেহেতু নবীগণের সত্যতাকে স্বীকার করে এই কারণে তাদেরকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, নবীগণের সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়াদিকে দেখা উচিত।

এখন আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহান কীর্তির বর্ণনা আরম্ভ করতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি একথা স্পষ্ট করে দেওয়া আবশ্যিক মনে করি যে, নবীদের যে আধ্যাত্মিক কাজ হয়ে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে যেটিই মূল কাজ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেটি সম্পর্কে আমি কিছুই বর্ণনা করব না। কেননা, আমি যদি আধ্যাত্মিক কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করি তবে একজন অ-আহমদী বলতে পারে যে, এটি আপনাদের দাবী, এটি কীভাবে স্বীকার করা সম্ভব। যেমন, নবীদের মূল ও প্রকৃত

কাজ হল মানুষের সঙ্গে খোদা তা'লার সম্পর্ক তৈরী করা। এখন যদি আমি বলি যে, হযরত মির্যা সাহেব তার মান্যকারীদের সঙ্গে খোদার সম্পর্ক করিয়েছেন, তবে একজন অ-আহমদী বলবে যে, এটি আপনার দাবী। মির্যা সাহেবকে অস্বীকার ব্যক্তি এই দাবীকে কীভাবে স্বীকার করতে পারে? এই কারণে আমি এই বিষয়টি বর্জন করছি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অন্যান্য মূখ্য কাজ গুলি বর্ণনা করছি যা অন্যদের জন্য গ্রহণীয় হতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রথম কাজ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রথম যে কাজটি করেছেন সেটি হল, সমস্ত নবীগণ এর অন্তর্ভুক্ত। নবী খোদা তা'লার প্রমাণ তাঁর পূর্ণ গুণাবলীর মাধ্যমে দিয়ে থাকে। খোদা তা'লা জগতবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। নবীগণ খোদা তা'লার পূর্ণ গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর (অস্তিত্বের) প্রমাণ দিয়ে থাকেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে যুগে আবির্ভুত হয়েছিলেন সেই সময় খোদা তা'লা জগতবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। এবং তিনি দৃষ্টির এত দূরে চলে গিয়েছিলেন যে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত মির্যা সাহেব নিদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে খোদা তা'লাকে পূর্ণ গুণাবলী সহকারে জগতের সামনে উন্মোচিত করেন। যেমন, হযরত সাহেবকে প্রারম্ভিক যুগে একটি ইলহাম হয়েছিল যে, " পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এল, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করল না। কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং অত্যন্ত প্রতাপশালী আক্রমণ দ্বারা তার সত্যতা জগতে প্রকাশ করে দিবেন।

এই ইলহাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)- সেই সময় প্রকাশ করেন যখন মানুষ তাকে চিনত না পর্যন্ত।

দেখ! এতে কতই না মহান সংবাদ দেওয়া হয়েছে! কোন মানুষ কি কোন মানবীয় পরিকল্পনায় এমন সংবাদ দিতে পারে? এই ইলহাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর উপর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পূর্বে হয়েছিল। এর মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তিনি জীবিত থাকবেন এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী করবেন। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী এই ছিল যে, যখন তিনি দাবী করবেন তখন জগতবাসী তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করবে। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, বিশ্ব-বাসী কোন সাধারণ বিরোধীতা করবে না, বরং প্রত্যেক প্রকারের আক্রমণ করা হবে। চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, খোদার পক্ষ থেকে সেই সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করা হবে এবং পৃথিবীর উপর শান্তি অবতীর্ণ হবে। পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তাঁর সত্যতা প্রকাশ পাবে।

সময়ের পূর্বে এবং যখন কি না বাহ্যিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকুল ছিল, তখন এই সমস্ত সংবাদ দেওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আশৈশব এতটাই দূর্বল শরীরের ছিলেন যে, অনেক সময় রোগের আক্রমণকালে তার আশপাশের লোকজন মনে করেছে, তিনি হয়তো মারা গেছেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি বলেন যে, এমন যুগ আসবে যখন প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, এরা বিরোধীতা করবে, আর এটিও সকলের ভাগ্যে জোটে না।

অতঃপর বিরোধীতা মৌখিক পর্যায়েও সীমিত থাকে। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব সম্পর্কে খোদা তা'লা তৃতীয় ভবিষ্যদ্বানী করেন যে, বিরোধীতা কোন সাধারণ প্রকারের হবে না, বরং তা এমন পর্যায়ের হবে যাকে প্রতিহত করার জন্য খোদা তা'লাকে প্রতাপশালী আক্রমণ করবেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ ঘোর আক্রমণ হবে, এবং দ্বিতীয়তঃ সকল প্রকারের হবে এবং অনেকগুলি জামাতের পক্ষ থেকে হবে। এর থেকে বোঝা যায় যে, শত্রুরাও বিভিন্ন প্রকারের কঠোর আক্রমণ করবে। যার উত্তরে খোদা তা'লাকেও সেই প্রকারের উত্তর দিতে হবে। শত্রুদের আক্রমণের ফলে সরকার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গ্রেফতার করার জন্য ওত পেতে ছিল, অন্যদিকে গদ্দীনশীন এবং মৌলবী তাঁর (আ.) বিরোধীতায় উন্মত্ত ছিল। সাধারণ মুসলমানরাও কোন অংশে কম ছিল না। তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র রচনায় লিপ্ত থাকে। হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁকে (আ.) ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়। তাঁর উপর অপবাদ দেওয়া হয়। তাঁর সম্মান-মর্যাদা, সততা, বিশ্বস্ততা, খোদা-ভীতি ও পবিত্রতার উপর আক্রমণ করা হয়। কিন্তু সকলে অকৃতকার্য হয়। পক্ষান্তরে তাঁর সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী এই ছিল যে, এই সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে খোদা তা'লার পক্ষ থেকেও আক্রমণ হবে। অতএব, এমনটিই হয়। যে ব্যক্তি যে উপায়ে আক্রমণ করেছিল সে তদনুরূপ ধৃত হয়। পঞ্চম ও শেষ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, খোদা তা'লা তাঁর সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন। এরই প্রমাণ হিসেবে আজকের জলসা রয়েছে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে তাঁর মান্যকারী রয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার সর্বত্র তাঁর অনুসারীরা রয়েছেন। এটা কি অদ্ভুত বিষয় নয় যে, মুসলমান বলে পরিচিত পৃথিবীর চল্লিশ কোটি (সেই যুগের হিসেবে) মানুষের হাতে আমেরিকায় তত সংখ্যক মানুষ মুসলমান হয় নি, যত সংখ্যক মুসলমান নগণ্য সংখ্যক আহমদীদের প্রচেষ্টায় হয়েছে । বর্তমানে এমন একজন আমেরিকান মুসলমানের মোকাবেলায় একশত আহমদী আমেরিকান। অনুরূপভাবে হল্যান্ডে অন্যান্য মুসলমানদের হাতে একজন মুসলমানও নেই, সেখানে আহমদী মুসলমানরা রয়েছেন এবং আরও অনেক দেশ আছে যেখানে আহমদী নাগরিকদের সংখ্যা সেই দেশে বসবাসরত অন্যান্য মুসলমানদের থেকে বেশি। এটি কতই না বড় সম্মান! এবং বীর-বিক্রমে আক্রমণের দ্বারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশ হওয়ার কত বড় প্রমাণ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আর একটি ইলহাম রয়েছে। সেটি হল- আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব"

লক্ষ্য করুন, পৃথিবীর অনেক স্থান এমন রয়েছে যেখানে সেখানকার প্রকৃত বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যান্য মুসলমান নেই, কিন্তু আহমদী মুসলমান আছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এর থেকে বেশি আর কোন অর্থে পূর্ণ হতে পারে?

অনরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমকালীনযুগে আরও পাঁচ-সাত জন দাবীদার দণ্ডায়মান হয়। যেমন-জাহীরুদ্দীন, আব্দুল লতিফ, মৌলবী মহম্মদ ইয়ার, আব্দুল্লাহ তিমাপুরী, নবী বখশ। এরা হল 'ইশতেহারী নবী'। এদের ছাড়াও ছোট ছোট আরও রয়েছে। কিন্তু তাদের কোন বিরোধীতা হয় নি। এমনটি তাদের সৌভাগ্য হয় নি।

যেহেতু বিরোধীরা বলে যে, মির্যা সাহেবের বিরোধীতা হয়েছে কারণ তিনি সত্যবাদী নন এবং ভুল পথে আছেন। তাই এই সকল দাবীদাররা প্রমাণ করেছে যে, মিথ্যা দাবীদারদের বিরোধীতা অর্জনেরও সৌভাগ্য হয় না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাজারো ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেগুলি পুস্তকসমূহের লিপিবদ্ধ আছে। মোট কথা আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.–)-এর মাধ্যমে সেই ভাবেই নিজের গুণাবলীর প্রমাণ দিয়েছেন যেভাবে তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের মাধ্যমে দিয়ে এসেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় কাজ

নবীর একটি কাজ হল একটি কর্মরত সক্রিয় দল বা জামাত গঠন করে যাওয়। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং লোকসংখ্যার দিক থেকে আমাদের জামাতের দূর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং এর তুলনায় এর কাজের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লক্ষ্য করুন। কোন ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, যে কাজ জামাত আহমদীয়া করছে তা অন্য কোন জাতি করছে না। অ-আহমদী পত্র-পত্রিকাতেও প্রায়ঃশই প্রকাশিত হয় যে, জামাত আহমদীয়া একটি সক্রিয় জামাত। রুশ, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশে আমাদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রচার হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে এমন কতজন বিত্তশালী ব্যক্তি আছেন যাদের এক এক জন এতপরিমাণ অর্থ দিতে পারে যতটা পরিমাণ অর্থ আমাদের পুরো জামাত একত্রে দিতে পারে না। আর শুধু দুই-একজন এমন ব্যক্তি নেই বরং এমন অনেক মানুষ অনেক আছেন। কিন্তু তা-সত্বেও সমগ্র হিন্দু জাতি একত্রিত হয়ে মালকানা অঞ্চলে আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে যখন আমাদের মুবাল্লিগ পৌঁছান তখন সকলে পশ্চাদগমণ করেন। সেই সময় দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানদের একটি সম্মেলন হয় যেখানে এই প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় যে, আসুন আমরা চুক্তি করি। এই সম্মেলনের আয়োজক ছিলেন, হাকিম আজমাল খান সাহেব, ডাক্তার আনসারী, মৌলবী মহম্মদ আলী সাহেব, এবং মৌলবী আবুল কালাম আজাদ। হিন্দুদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধানন্দ সাহেব ও প্রমূখ ছিলেন। উলেমারা আমাদের প্রতি যেরূপ আচরণ করে এসেছে, ঠিক সেই মত তারা বলল, আহমদীদেরকে আহ্বান করার প্রয়োজন কি? এবং তারা নিজেরাই চুক্তির শর্ত তৈরী করতে আরম্ভ করে। কিন্তু শ্রদ্ধনন্দ জি বলেন, আহমদীরাও এই অঞ্চলে কাজ করছে, তাদেরকে ডাকা উচিত। ফলে হাকীম আজমল খান সাহেব, ডাক্তার আনসারী এবং মৌলবী আবুল কালাম আজাদ সাহেবের পক্ষ থেকে আমার কাছে বার্তা আসে যে, আপনার প্রতিনিধি পাঠান। আমি এখানকার লোকদের পাঠিয়ে তাদেরকে বলে দিই যে, মালকানাদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে এবং বলা হবে যে, হিন্দু ও মুসলমান নিজের নিজের স্থানে বসে পড়ুন। কিন্তু হিন্দুরা কুড়ি হাজার মালকানাদেরকে ধর্মচ্যুত করে। এই কারণে যখন এই প্রশ্ন উঠবে তখন আপনারা বলবেন যে, আমাদেরকে কুড়ি হাজার ধর্মচ্যুত মুসলমানদেরকে কলেমা পাঠ করিয়ে নিতে দিন তবেই এই শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং আমরা সেখান থেকে ফিরে আসব। নচেৎ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মালকানাও ধর্মচ্যুত থাকবে আমরা সেখান থেকে নড়ব না। সুতরাং আামাদের লোক সম্মেলনে উপস্থিত হলে এই প্রশ্ন তোলা হয়। আর তারা সেকথায় বলে যা আমি তাদেরকে শিখিয়েছিলাম। কিন্তু মৌলবীরা বলে যে, আহমদীরা কোন ছার! ছাড়ুন ওদের। আমাদের সঙ্গে চুক্তি করুন। শ্রদ্ধানন্দ জী তখন তাদের সামনে বললেন যে, যদি আপনাদের যদি পঞ্চাশ ব্যক্তিও সেখানে থাকে তবে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে একজনও আহমদী থাকবে ততক্ষণ চুক্তি হতে পারে না। আগে আহমদীদেরকে সেখান থেকে বের কর তারপর চুক্তির অগ্রসর হও।

মোটকথা, জামাত আহমদীয়ার কাজের গুরুত্ব তারাও স্বীকার করল যারা জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং যারা ইসলামের শত্রু তারা স্বীকার করে। খোদার অনুগ্রহে আমাদের জামাত ধর্মীয় জগতে এমন গুরুত্বের দাবী রাখে যে জগত আজ বিস্মিত। আর এ সব কিছু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে অর্জিত হয়েছে। তাঁর এই কাজটিকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তৃতীয় কাজ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তৃতীয় কাজ হল আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ও বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল তিনি (আ.) সেগুলির সংশোধন করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মহান সত্তা হল খোদা তা'লার। কিন্তু তাঁর সত্তা সম্পর্কে মুসলমান ও অন্যনা ধর্ম এত বেশি কুধারণায় পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং এমন সব অযৌক্তিক কথা বর্ণনা করা হত যে, সেগুলিকে সামনে রেখে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কারোর মনোযোগ সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব ছিল না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ভুলটির সংশোধন করেছেন।

(১) মানুষ প্রকাশ্য ও গোপন শিরকে লিপ্ত ছিল। (২) কিছু মানুষ খোদা তা'লা সম্পর্কে বিশ্বাস করত যে, খোদা তা'লা এখন জরাগ্রস্ত। তারা খোদা তা'লার ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার করত এবং ধারণা করত যে, যেভাবে কোন যন্ত্র চালিত হয়, ঠিক সেই ভাবেই খোদা তা'লা দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। কিছু মানুষ এই ধারণা পোষণ করত যে, এই পৃথিবী নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এটি অনাদি। পৃথিবীতে খোদা তা'লার কাজ হল কেবল সংযোজন ও বিয়োজন করা। কিছু মুসলমানও এই ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। (৪) কিছু মানুষ খোদা তা'লার দয়ার গুণকে অস্বীকারকারী করতে শুরু করে। তাদের দাবী খোদার মধ্যে দয়ার গুণ পাওয়া যায় না। কেননা, সেটি ন্যায়ের পরিপন্থী। (৫) কিছু মানুষ খোদা তা'লার কুদরত সম্পর্কে এমন অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ধারণা পোষণ করত যে, তারা খোদা তা'লার গুণাবলীর প্রকাশকে কেবলমাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সীমিত করে রেখেছিল এবং তারা ধারণা করত যে খোদা তা'লার গুণবলী কেবল এই কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। আর যদি তারা এই সময়কালকে দীর্ঘায়িত করত তবে তা সেই সীমা পর্যন্ত যেন পৃথিবীর আয়ু লক্ষ বছর এবং খোদা তা'লার গুণাবলীকে সেই সীমা পর্যন্তই সীমিত রাখত। (৬) কিছু মানুষ খোদা তা'লার কুদরতকে অনুচিত পন্থায় প্রমাণ করে দাবী করত যে, খোদা তা'লা মিথ্যা কথাও বলতে পারে, তিনি চুরিও করতে পারেন। যদি না করতে পারেন তবে প্রমাণিত হল যে, এক্ষেত্রে তিনি শক্তি রাখেন না। (৭) কিছু মানুষ খোদা তা'লা কর্তৃক ভাগ্য ও নিয়তি এবং প্রকৃতি সংক্রান্ত আইন জারি করার পর তাঁকে সম্পূর্ণ অকেজো মনে করল এবং এই কারণেই তারা মনে

করত যে, দোয়া একটি নিরর্থক বিষয়। দোয়ার কারণে প্রকৃতির নিয়মে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে না। (৮) মানুষ খোদা তা'লার সমস্ত গুণাবলী একই সঙ্গে জারি হওয়া সম্পর্কে অনবহিত ছিল এবং এবিষয়টি তাদের বোধগম্যের অতীত ছিল যে, খোদা তা'লা যিনি কঠোর শাস্তি-দাতা তিনি এই গুণটি ধারণ করে একই সময়ে কিভাবে অশেষ কৃপাবান হতে পারেন। তারা আশ্চর্য্য হত যে, একজন মানুষকে একই সাথে অত্যন্ত দানশীল এবং কৃপণ কিভাবে বলা যেতে পারে? যদি এটা সম্ভব না হয় তবে খোদার জন্য কিভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, তিনি রুদ্র এবং কোমল। যেহেতু কুরআন মজীদে খোদা তা'লার এমন গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে যা দৃশ্যতঃ পরস্পর বিরোধী। এই কারণে তারা আশ্চর্য্য হত। (৯) কিছু মানুষ এই ধারণায় নিপতিত ছিল যে, প্রত্যেক বস্তুই খোদা। কিছু মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, খোদা তা'লা একটি সিংহাসনে বসে আদেশ দেন। (১০) মানুষের খোদার প্রতি কোন মনোযোগই ছিল না, কিন্তু যখন ঘর ভুপতিত হয় তখনই কেবল আল্লাহকে স্মরণ করে। অথবা যে নিঃস্ব, তার সম্পর্কে বলা হত যে তার আল্লাহ্ আছে। যার অর্থ হল খোদা তা'লা হল অসহায়ত্বের নাম। মানুষের মন থেকে খোদা তা'লার ভালবাসা এবং তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যকুলতা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জিন-ভুতের সাক্ষাত এবং মন্ত্র-তন্ত্রের সাধনা করার বাসনা তো ছিল, কিন্তু খোদা তা'লার সঙ্গের সাক্ষাতের বাসনা কারোর মনে ছিল না।

এই সকল অনৈক্যের দুর্যোগের সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভুত হন এবং এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ধর্মকে পবিত্র করেন।

খোদা তা'লার সত্তা সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল- তিনি মানুষের মনোযোগকে খোদার দিকে ফিরিয়ে দেন এবং খোদার সাথে তাদের প্রকৃত ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি খোদার নৈকট্য অর্জনকারীতে পরিণত করেন এবং যারা এখনও পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করে নি তাদের মনোযোগও খোদার দিকে এমনভাবে ফিরে আসছে যে যা তাঁর দাবীর পূর্বে কখনো হয় নি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চতুর্থ কাজ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চতুর্থ কাজ হল তিনি ঐশী বাণীর সত্যতা প্রকাশ করেন এবং এ সম্পর্কে মানুষের মনে যে বিভিন্ন অবধারণা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির সংশোধন করেন। ইলহাম সম্পর্কে বিভিন্ন ভয়াবহ ধারণা প্রচলিত ছিল। মানুষ মনে করত (১) ইলহাম হয় ঐশী বা শয়তানী হয়ে থাকে। (২) ইলহাম কেবল নবীদেরকে হতে পারে। (৩) কিছু মানুষ মনে করত যে, ইলহাম কথার রূপে হয় না। অন্তরের জ্যোতিঃ থেকে গৃহীত জ্ঞানের নামই হল ইলহাম। (৪) কিছু মানুষ এই কুমন্ত্রণার শিকার হয়েছিল যে, ইলহাম ও স্বপ্ন মস্তিষ্কের বিশেষ পরিস্থিতির পরিণাম। (৫) কিছু মানুষ ধারণা করত যে, কথার রূপে ইলহাম সম্পর্কিত মতবাদ পোষণ করা মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তঃরায়। (৬) সাধারণভাবে মানুষ এই ধারণার শিকার ছিল যে, এখন ইলহামের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই ধরণের আরও কুমন্ত্রণা মানুষের মধ্যে পাওয়া যেত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেগুলির সংশোধন করেন।

(হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকের উদ্ধৃতির আলোকে ইলহামের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন ইলহাম দুই প্রকারের। সত্য ইলহাম এবং মিথ্যা ইলহাম। অর্থাৎ ঐশী ইলহাম ও শয়তানী ইলহাম। ঐশী ইলহামের কয়েকটি প্রকার তিনি বর্ণনা করেন। যেমন- নবীগণের উপর অবতীর্ণ হওয়া ইলহাম, আওলিয়াদের উপর অবতীর্ণ হওয়া ইলহাম, মোমেন ও সত্যবাদীদের উপর অবতীর্ণ হওয়া ইলহাম, অ-মোমিনদের উপর অবতীর্ণ হওয়া ইলহাম, কারোর কল্যাণে হওয়া ইলহাম ইত্যাদি। তিনি (রা.) শয়তানী ইলহামেরও কয়েকটি শ্রেণী বর্ণনা করেন। যেমন, প্রবৃত্তিগত ইলহাম, যৌক্তিক ইলাহাম, মস্তিষ্কের কলুষতার কারণে সৃষ্ট ইলহাম। এই প্রসঙ্গে মস্তিষ্কের কলুষতার কারণে সৃষ্ট ইলহাম, কামনা-বাসনা প্রসূত ইলহাম ও স্বপ্ন সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন।

কুরআন করীম সম্পর্কে ভ্রান্তধারণার অপনোদন

ঐশী কালাম বিশেষতঃ কুরআন করীমে সম্পর্কে মানুষের মনে অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা দানা বেঁধে বসেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেগুলিকে দূর করেন। যেমন- (১) কিছু মুসলমানদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল এবং তারা বিশ্বাস করত যে, এর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে এবং কিছু অংশ ছাপা হয় নি। এই ভুল ধারণাটিও তিনি (আ.) দূর করেন এবং বলেন, কুরআন করীম একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

(২) দ্বিতীয় অবধারণা মুসলমানদের মধ্যে এই ছিল যে, কুরআন করীমে কিছু অংশ রহিত ও অচল হয়ে গেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তর অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদান করেন। যে আয়াতগুলিকে মানুষ রহিত আখ্যা দিয়েছিল সেগুলি থেকে এমন তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ অর্থ বর্ণনা করলেন যা শুনে শত্রুরাও হতচকিত হয়ে গেল। তাঁর দ্বারা বর্ণিত নীতি অনুযায়ী কুরআনের একটিও আয়াত এমন নেই যার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা যায় না।

(৩) কুরআন সম্পর্কে তৃতীয় যে ভুলটি মানুষ করছিল সেটি হল, মুসলমানদের অধিকাংশই মনে করতো যে, এর তত্ত্বজ্ঞানের ধারা পূর্বেই বারিত হয়েছে। তিনি (আ.) ভ্রান্তিটিও দূর করেন। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রবলভাবে সরব হন এবং প্রমাণ করেন যে, এর তত্ত্বজ্ঞানের ধারা না পূর্বে বারিত হয়েছে না ভবিষ্যতে হবে।

(৪) চতুর্থ ভুল এই ছিল যে, মানুষ ধারণা করে বসেছিল যে, কুরআন করীমের বিষয়বস্তুগুলি কোন বিশেষ শ্রেণি-বিন্যাসের অধীনে নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই মারাত্মক অভিযোগটিকে খণ্ডন করেন।

(৫) পঞ্চম যে ভ্রান্ত-ধারণাটি মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল সেটি হল কুরআন করীমের আয়াতের মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রমাণ করেন যে, কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুতে কোন স্ববিরোধ নেই।

(৬) ৬ষ্ঠ ভুল কুরআন করীম সম্পর্কে যেটি সাধারণ মুসলমানগণ করছিল সেটি হল, কুরআন করীমে শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে পূর্বের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে । হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সন্দেহ ও সংশয়টিকে দূর করেন এবং প্রমাণ করেন যে, কুরআন করীমে শিক্ষার জন্য কাহিনী বর্ণনা করা হয় নি। যদিও কুরআনের ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা অর্জন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আর যা কিছু ঐ সকল

ঘটনাবলীতে বর্ণিত হয়েছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনিট ঘটতে চলেছে আর এই কারণেই কুরআন করীমে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কেবল কাহিনী বর্ণনা করে না বরং কিছু নির্বাচিত অংশের উল্লেখ করে থাকে।

(৭) আরও একটি সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল যে, কুরআন করীমে ইতিাসের বিপরীত ঘটনা বর্ণিত আছে। এই সন্দেহ মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয়ের মধ্যেই দানা বেঁধেছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উপরোল্লেখিত অভিযোগের উত্তরে এই সত্য উপস্থাপন করেন যে, কুরআন করীম আল্লাহ্ তা'লার বাণী। অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা নিশ্চয় সত্য।

(৮) আরও একটি ভুল যার মধ্যে মানুষ নিপতিত ছিল তা হল এই যে, কুরআন করীম কিছু এমন ছোট ছোট বিষয় বর্ণনা করেছে যেগুলি বর্ণনা করা জ্ঞান-বুদ্ধি এবং মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনের জন্য উপযোগী হতে পারে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেন এবং বলেন যে, কুরআন করীমে কোন বিষয় নিরর্থক বর্ণনা করা হয় নি বরং যা কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) কিছু মানুষ মনে করতে আরম্ভ করে যে, কুরআন করীমের অনেক দাবী এমন আছে যেগুলি দলিল-বিহীন, যেগুলিকে দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা যায় না। মুসলমানরা বলে যে, যেহেতু কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী এই কারনে এতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে আমরা সেগুলিকে মান্য করি। অন্যেরা বলে, এটি অংলগ্ন কথাবার্তা, আমরা এটিকে কীভাবে মানতে পারি? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন করীমের প্রত্যেকটি দাবি অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কুরআন প্রত্যেক দাবির সপক্ষে নিজই দলিল পেশ করে। তিনি (আ.) বলেন- এই বিষয়টিই কুরআন করীমকে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থাবলীর তুলনায় বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে।

(১০) কিছু মানুষের ধারণা ছিল কুরআন করীম নিশ্চিত ও প্রমাণ-সিদ্ধ জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিরুদ্ধে যায়। এই ভ্রান্তিটিও তিনি (আ.) দূর করেন এবং বলেন, কুরআন করীমই তো একমাত্র গ্রন্থ যা প্রকৃতি বা খোদার কাজকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করে এবং এর গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং বাহ্যিক তন্ত্র অর্থাৎ প্রকৃতিকে অভ্যন্তরীন তন্ত্র অর্থাৎ ঐশী বাণীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আাখ্যা দেয়। অতএব একথা বলা অনুচিত যে, কুরআন করীম প্রকৃতির জ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলে। খোদা তা'লার কথা ও কাজ কখনোই একে অপরের বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

১১) মানুষ কুরআন করীমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করছিলেন। তিনি (আ.) ব্যখ্যার ভিত্তি এমন নীতির উপর রাখেন যার ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

(১২) মানুষ মনে করত যে, কুরাআন করীম হাদীসের অধীন। এমনকি এই দাবীও করা হত যে, হাদীস কুরআন করীমের আয়াত রহিত করার অধিকার রাখে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: কুরআন করীম বিচারক। হাদীস এর অধীনে। আমরা কেবল সেই হাদীসগুলিকেই মান্য করব যেগুলিকে কুরআন করীমের অধীনে হবে, নচেৎ প্রত্যাখ্যান করব। অনুরূপভাবে ঐ সকল হাদীস যা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেননা, খোদা তা'লার বাণী ও কাজ কখনো পরস্পর বিরোধী হতে পারে না।

(১৩) আরও একটি ত্রুটি তৈরী হয়েছিল যেটি হল, তারা মনে করত কুরআন করীম একটি পূর্ণাঙ্গীন কিতাব যাতে প্রমূখ বিষয়গুলি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। নৈতিক সৌন্দর্য্য এবং সামাজিক বিষয়ে এর মধ্যে কিছু বলা হয় নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবি করেন যে, কুরআন করীম একটি পূর্ণাঙ্গীন কিতাব যা আধ্যাত্মিকতা, জাগতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং নৈতিকতার বিষয়ে যা যা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন তা সবই বর্ণনা করেছে। তিনি (আ.) বলেন, আমি এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞাত করতে প্রস্তুত আছি।

(১৪) লোকেদের মনে এমন ধারণাও জন্ম নিয়েছিল যে, কুরআন করীমের কিছু শিক্ষা সাময়িক এবং আরবদের পরিস্থিতি ও এবং সেই যুগ অনুসারে ছিল। এখন সেগুলিতে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এটি অুনচিত কাজ। কুরআন করীমে যাবতীয় বিধি-নিষেধ সঠিক, এগুলি সাময়কি নয়। কেবল মাত্র সেই আয়াতগুলি ব্যতিরেকে যেগুলি সম্পর্কে স্বয়ং খোদা তা'লা ঘোষণা দিয়েছেন যে, অমুক নির্দেশ অমুক সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

(১৫) অনেকে কুরআন করীমকে অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ মনে করে এবং দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োগ ও প্রয়োজনকে অনুভব করে না। পরিণামে, এর তিলাওয়াত এবং এর অর্থের দিকে মনোযোগ দেওয়ার তাকিদ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছিল। সুন্দর আবরণে আবৃত করে কুরআন করীমকে তারা রেখে দিত অথবা কেবলই তিলাওয়াত করাকেই যথেষ্ট মনে করত। কোথাও কুরআন করীমের দরসের ব্যবস্থা হত না। এমনকি এর অনুবাদও পাঠ করা হত না। অনুবাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে তফসীরের উপর নির্ভরশীল ছিল। হযরত মসীহ মওমউদ (আ.) সেই যুগে কুরানকে তার সঠিক অর্থে উপস্থাপন করেন এবং মানুষকে কুরআন করীম পাঠের দিকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর পূর্বে কুরআন করীমের কাজ কেবল এতটুকু মনে করা হত যে, কুরআন করীমের নাম মিথ্যা কসম খাওয়ার জন্য নেওয়া হয় কিম্বা মৃতদের উপর পাঠ করার জন্য এর প্রয়োগ করা হয় এবং এটি সুন্দর আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে তাকে সাজিয়ে রাখার জন্য।

এটি কি অদ্ভুত বিষয় নয় যে, কবিগণ খোদা তা'লার মহিমা ও গণকীর্তনের জন্য এভং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশংসায় অসংখ্য কবিতা ও ছন্দ রচনা করেছেন, কিন্তু কুরআন করীমের প্রশংসায় কেউ কোন কবিতা লেখে নি। হযরত মির্যা সাহেবই সেই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি কুরআন করীমের প্রশংসায় নযম লিখেন,

" জামাল ও হুসনে কুরআন নুরে জানে হার মুসলমাঁ হ্যায়।

কামার হ্যায় চাঁদ অউরোঁ কা হামারা চাঁদ কুরআঁ হ্যায়। "

অর্থাৎ কুরআনের সৌন্দর্য্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের জ্যোতিঃ

'কামার' (চাঁদ) হল অন্যদের চাঁদ, আমাদের চাঁদ হল কুরআন।

কেউ যদি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্তুতিমূলক নযম পাঠ করতে চায় তবে সে খুঁজলে সে পেয়ে যায়। খোদা তা'লার মহিমা ও গুণকীর্তন করতে চাইলেও অজস্র নযম পাওয়া যায়। কিন্তু কুরআন

শরীফের প্রশংসার জন্য কোন নযম খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কারণেই ঘোর শত্রুরাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পড়তে বাধ্য হয়। এবং তারা একথাও বলে যে, মির্যা সাহেব মন্দ হলেও তিনি এই নযমটি চমৎকার লিখেছেন। এইভাবে তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কালাম পড়ে থাকে এবং প্রমাণ করে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সঠিক অর্থে কুরআন করীমকে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে নামিয়ে এনেছেন।

ফিরিশতাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারাণার অপনোদন

পঞ্চম কাজ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেটি করেছেন সেটি হল, ফিরিশতাদের সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি দূর করেছেন।

(১) কিছু লোক বলত, মানবীয় শক্তিকে ফিরিশতা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া খোদা তা'লার ফিরিশতার প্রয়োজন কী? তিনি (আ.) এই ধারণাটিকে খণ্ডন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন ফিরিশতাদের অস্তিত্ব কাল্পনিক নয়, বরং জগত কারখানায় তারা এক উপযোগী সত্তা।

(২) ফিরিশতাদের সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল সেটি হল, ফিরিশতারাও মানুষের মত চলাফেরা করে নিজেদের কর্তব্য পালন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, তারা সর্বত্র বিচরণ না করে প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

(৩) ফিরিশতাদের সম্পর্কে এই ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তারাও পাপ করতে পারে। আদম -এর ঘটনা সম্পর্কে একথা বলা হত যে, ফিরিশতাগণ আদমকে সৃষ্টি করার আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্তে আপত্তি করেন। অনুরূপভাবে এমনটিও মনে করা হত যে, কয়েক ফিরিশতা পৃথিবীতে এসেছিল এবং সে তারা একজনের প্রেমে পড়ে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন এবং তারা 'চাহে বাবুল'-এ এখন বন্দী দশায় রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সকল অপবাদ থেকে ফিরিশতাদেরকে মুক্ত করেন।

(৪) ফিরিশতাদেরকে নিরর্থক সৃষ্টি মনে করা হতো। যেরূপ বড় বড় বাদশাহ নিজের চারপাশে মানুষের একটি বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, অনুরূপে খোদা তা'লাও ফিরিশতাদেরকে রেখেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এমনটি ধারণা করা ভুল। সমগ্র জগত-কারখানা তাদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও তাদের কাজ হল মানুষে হৃদয়ে প্রেরণার সঞ্চার করা। মানুষ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে।

নবীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণার অপনোদন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ৬ষ্ঠ কাজ হল নবীগণ সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত-ধারণা দূর করা।

(১) নবীদের সম্পর্কে মানুষের মনে যে সব ভ্রান্তধারণা দানা বেঁধেছিল সেগুলির মধ্যে প্রথমটি হল, মুসলমানদের মধ্যে আওলিয়া আল্লাহ এবং সুফিগণ ও তাদের সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণ ব্যতিরেকে পুরো সুন্নী সম্প্রদায় নবীদের সম্মান ও মর্যাদার বিরোধী ছিল। কেউ কেউ কেবল সম্ভাবনা ব্যক্ত করার সীমা পর্যন্ত নিজেদেরকে সীমিত রাখে, কিন্তু অনেকে এমন ছিল যারা নবীদের প্রতি সরাসরি পাপের অভিযোগ আরোপ করেছিল এবং এটিকে মোটেও কোন দোষ মনে করত না। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে বলত যে, তিনি তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলত যে, তিনি চুরি করেছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ.) সম্পর্কে বলত যে, তিনি খোদা তা'লার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলত যে, তিনি পরকীয়া প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাকে অর্জন করার জন্য তার স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে মেরে ফেলেন। এই ব্যধি এতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল যে, সৈয়্যদ উলদে আদম মহম্মদ (সা.)-এর সত্তাও সুরক্ষিত ছিল না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন এধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হয় সেগুলি সব মিথ্যা। নবীদের দ্বারা কখনোই কোন পাপ সম্পাদিত হতে পারে না।

(২) নবীদের সম্পর্কে যে দ্বিতীয় ভুল মানুষ করত সেটি হল এই যে, তারা মনে করত যে, নবীদের বোঝার ভুল হতে পারে না। এটি অদ্ভুত কথা যে, একদিকে তারা মনে করে নবীরা পাপী হতে পারে, অপরদিকে একথাও বলে যে, নবী বোঝার ক্ষেত্রে ভুল করতে পারে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে জ্ঞানগত বিষয় বলে আখ্যা দেন এবং বলেন যে, নবীদের বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হওয়া কেবল সম্ভবই নয় বরং তা আবশ্যক, যাতে বোঝা যায় যে, নবীর উপর যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সেটি তার নিজের নয় বরং অন্য কোন সত্তা সেটি নাযিল করেছেন।

দ্বিতীয়ত নবীরা না কেবল বোঝার ক্ষেত্রে ভুল করেন বরং অনেক সময় স্বয়ং খোদা তা'লা নবীকে ভুল করতে বাধ্য করেন, যাতে প্রথমতঃ নবীকে নির্বাচিত করেন অর্থাৎ তার পদমর্যাদা উচ্চতর করেন। এর উদাহরণ হল হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর স্বপ্ন। যখন তাকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তিনি তার পুত্রকে জবেহ করছেন তখন এর অর্থ এই ছিল না যে, তিনি তাকে হত্যা করবেন। কেননা, যদি এটি এর অর্থ হত তবে যখন তিনি জবেহ করতে উদ্যত হন তখন তাঁকে নিষেধ করা হত না।

(৩) তৃতয়ি ভুল নবীদের সুপারিশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এর দুইটি ভাগ রয়েছে। (১) কিছু মানুষ মনে করত যে, যা ইচ্ছে কর, শাফায়াত' (সুপারিশ)-এর মাধ্যমে সব কিছুর ক্ষমা হয়ে যাবে।

(২) কিছু লোক এর বিপরীত ধারণা পোষণ করত। তাদের ধারণা ছিল, 'শাফায়াত' হল শির্ক এবং খোদা তা'লার গুণাবলীর পরিপন্থী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই দুটি ভুল অপসরন করেন। তিনি 'শাফায়াতে'র বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 'শাফায়াত' বিশেষ পরিস্থিতিতে হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'লার আদেশে হয়ে থাকে। অতএব 'শাফয়াতের উপর নির্ভর করা সঠিক নয়। 'শাফায়াত' কেবল সেই সময় সম্ভব যখন যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্বেও মানুষের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ 'শাফায়াত'কারীর রঙে রঙীন না হয় 'শাফায়াত হতে পারে না। কেননা, শাফায়াতের অর্থ হলো জুড়ি। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ রসুলের জুড়ি না হবে শাফায়াতের মাধ্যমে তাদেরক ক্ষমা করা হবে না। এছাড়াও যারা বলে যে, শাফায়াত শির্ক তাদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন যদি আদেশের মাধ্যমে 'শাফায়াত' (সুপারিশ) করানো হয়, অর্থাৎ যদি রসুলুল্লাহ (সা.) খোদাকে আদেশ দিয়ে বলেন যে, অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা কর তবে এটি শিরক হত। কিন্তু খোদা তা'লা বলেন 'সুপারিশ' আমার আদেশে হবে। অর্থাৎ আমরা রসুলকে এই কাজ করার আদেশ দিব। যখন আমি বলব হে নবী তুমি

সুপারিশ কর তখন নবী সুপারিশ করবে। আর এটি কোনক্রমেই শিরক হতে পারে না। এর মধ্যে খোদার সমতুল্য হওয়ার বিষয় নেই। এর দ্বারা খোদার কোন গুণের উপর পর্দা পড়ে না।

(৪) চতুর্থতঃ মানুষ হযরত ঈসা নাসেরী (আ.) সম্পর্কে ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। মসীহ্‌র সত্তাকে কেন্দ্র করে কেবল একটি ভুলই হয় নি বরং তিনি একাধিক ভুলের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। আরও বিচিত্র বিষয় এই যে, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন জাতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই সকল ভ্রান্তিকে দূর করেন।

হযরত মসীহ নাসেরী (আ.) কে প্রসঙ্গে সবথেকে বড় ভুল যেটি ছিল সেটি তাঁর জন্মের বিষয়ে ছিল। মুসলমান ও অন্যান্য জাতি এই ধারণা পোষণ করত যে, হযরত মসীহর জন্ম সাধারণ মানুষের জন্মের উর্দ্ধে একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল। তাঁর জন্মকে আল্লাহ্‌র আত্মা এবং কথার মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়ার একটি অনন্য ঘটনা বলে মনে করা হত । এই অবধারণা অনেক শিরকের জন্ম দিয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সম্পর্কে বলেন- সমস্ত নবীর মধ্যেই আল্লাহ্‌র আত্মা ছিল এবং সকলেই আল্লাহ্‌র বাণী ছিলেন। হযরত মসীহ্‌র উপর যেহেতু আপত্তি করা হত এবং নাউযুবিল্লাহ্‌ তাঁকে অবৈধ সন্তান বলে অপবাদ দেওয়া হত এই কারণে তাঁকে এই অপবাদ থেকে মুক্তি দিতে তাঁর সম্পর্কে এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ সমস্ত নবীই রুহুল্লাহ্‌ এবং কলেমাতুল্লাহ ছিলেন। কুরআন শরীফে হযরত সুলেমান (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি কুফর করেন নি। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, কেবল সুলেমান (আ.) কুফর করেন নি, এবং অন্যান্য নবীগণ কুফর করেছিলেন। তাঁর কুফর না করার বর্ণনার একমাত্র কারণ হল তাঁর উপর কুফরের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে তাঁর সম্পর্কে এই অপবাদটিকে খণ্ডন করা হয়েছে। অন্যান্য নবীদের সম্পর্কে যেহেতু এমন অপবাদ দেওয়া হয় নি এই কারণে তাদের সম্পর্কে তাদের সম্পর্কে এমন অপবাদ খণ্ডন করার প্রয়োজন হয় নি। (হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ নাসেরী (আ.) সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন এবং সেগুলিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিভাবে খণ্ডন করেছেন তার বর্ণনা করেছেন।)

মোজেযা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

সপ্তম কাজ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল, মোজেযা বা অলৌকিক নিদর্শন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে ভ্রান্ত-ধারণা ঘর করেছিল সেগুলির তিনি (আ.) সংশোধন করেন। পৃথিবী 'মোজেযা' সম্পর্কে দুটি দলে বিভক্ত ছিল। কিছু মানুষ সম্পূর্ণরূপে 'মোজেযা'র অস্বীকারকারী ছিল। অপরদিকে কিছু মানুষ চটকদার অলৌকিক কাহিনীকে 'মোজেযা' রূপে স্বীকার করে। যারা মোজেযাকে অস্বীকার করত হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তাদের সামনে নিজের মোজেযা উপস্থাপন করে নিরুত্তর করে দেন।

যারা চটকদার অলৌকিক কাহিনীকে 'মোজেযা' আখ্যা দিচ্ছিল, তাদেরকে তিনি (আ.) বলেন যে, মোজেযা হল একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার নাম। অসাধারণ বিষয় স্বীকার করার জন্য অসাধারণ প্রমাণেরও প্রয়োজন হয়। অতএব এই সকল মোজেযাকে স্বীকার করা যেতে পারে। (১) ঐশী গ্রন্থে যেগুলি সম্পর্কে উল্লেখ থাকে অথবা যেগুলির সমর্থনে জোরালো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে। (২) দ্বিতীয়তঃ সেগুলি যেন খোদার নিয়ম বিরুদ্ধ না হয়।..... উদাহরণস্বরূপ খোদা তা'লা বলেন, কোন মৃত ব্যক্তি এই পৃথিবীতে জীবিত হতে পারে না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দাবি করে যে, অমুক নবী বা ওলী মৃতকে জীবিত করেছে, তবে যেহেতু এটি কুরআন বিরুদ্ধ বিষয়, তাই আমরা সেটিকে স্বীকার করব না। কেননা, 'মোজেযা' প্রদর্শনকারী সত্তা নিজেই বলেন যে, তিনি মৃতকে জীবিত করবেন না।

(৩) তৃতীয় শর্ত হিসেবে তিনি (আ.) বলেছেন, মোজেযার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন রূপ থাকা আবশ্যক। যদি এই প্রচ্ছন্ন রূপ না থাকে তবে 'মোজেযা'-র প্রকৃত উদ্দেশ্য বৃথা যায়। তা ঈমান সৃষ্টি করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ যদি আজরাইল এসে যদি বলে যে, অমুক নবীকে মেনে নাও, নচেৎ তোমার প্রাণ হরণ করব। তবে সমস্ত মানুষ মেনে নিবে আর এমন ঈমানের কোন লাভ থাকবে না। অতএব, মোজেযার জন্য প্রচ্ছন্ন রূপ থাকা জরুরী। কেননা মোজেযা ঈমানের জন্য প্রকাশ পায়।

(৪) চতুর্থ শর্ত হল, মোজেযার মধ্যে কোন কল্যাণ উদ্দিষ্ট থাকে, কেননা, মোজেযা কোন বৃথা কর্ম বা হাসি-তামাশা স্বরূপ প্রকাশ করা হয় না। বরং এর মধ্যে কোন গোপন উদ্দেশ্য থাকে। নচেৎ এটিকে খোদার দিকে আরোপিত করা যেতে পারে না।

শরীয়তের মহত্ব প্রতিষ্ঠা

৮ম কাজ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পাদন করেছেন সেটি হল তিনি শরীয়তের মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শরীয়তের মহত্ব মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয়ের মধ্য থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি (আ.) পুনরায় এই হৃত মর্যাদাকে ফিরিয়ে আনেন।

(১) শরীয়ত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় কুমন্ত্রণা যেটি সৃষ্টি হয়েছিল সেটি হল মানুষ শরীয়তকে বোঝা মনে করতে শুরু করেছিল। খৃষ্টানরা দাবী করত যে, ঈসা মসীহ মানুষকে শরীয়তের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছিলেন। এর থেকে প্রতীত হয় যে, শরীয়ত তাদের কাছে অভিশাপ ছিল যার থেকে তিনি তাদেরকে রক্ষা করতে এসেছিলেন। অথচ শরীয়ত পথ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ছিল, আর কোন ব্যক্তি পথ-প্রদর্শনকে অভিশাপ রূপে অভিহিত করে না। কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে সোজা পথ বলে দেয় তবে কি সেই ব্যক্তি বলে যে, সে আমাকে অভিশাপ দিল? মুসলমানরাও শরীয়তকে অভিশাপ মনে করতে আরম্ভ করে, কেননা, তারা শরীয়তের অমুক অমুক আদেশ থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন উপায় বের করার চেষ্টা করেছে। এমনকি কিছু কিছু মানুষ বিভিন্ন উপায় উল্লেখ করে বই লিখেছে। যদি তারা শরীয়তকে অভিশাপ না মনে করত এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কেন সন্ধান করত? ওহাবী সম্প্রদায় কোন প্রকারের এর থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা বিচিত্র সব উপায় ও ওজর তৈরী করে রেখেছিল। যেমন- একটি প্রসিদ্ধ ফিকাহ্‌র বই-য়ে লেখা আছে যে, ঈদের নামাযের পর কুরবানী করা সুন্নত। কিন্তু যদি নামাযের পূর্বে কারোর কুরবানী করার

প্রয়োজন হয় তবে সে যেন শহর সংলগ্ন কোন গ্রামে গিয়ে ছাগল জবেহ করে এবং যেন সেখান থেকে শহরে গোশত নিয়ে আসে। কেননা ঈদ শহরে হতে পারে এবং এখানে ঈদের পরে কুরবানী করার শর্ত রয়েছে।

(২) দ্বিতীয় কুমন্ত্রণা এই প্রকারের ছিল যে, কিছু মানুষ বলত- শরীয়ত প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষের খোদা পর্যন্ত পৌঁছানো। তাই যদি খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাই তবে শরীয়তের উপর আমল করার প্রয়োজন কি?

এই ভয়াবহ ব্যধি মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। সুফি পরিচয়দাতারা শরীয়তের আদেশের উপর আমলা করা ছেড়ে দিচ্ছিল। আর যখন মুসলমান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, শরীয়তের আদেশের উপর আমল কেন কর না? তখন তারা জবাব দেয় যে, আমরা খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি। এখন শরীয়তের উপর আমল করার প্রয়োজন কী?

(৩) তৃতীয় সংশয় যা যা মুসলমানদের মনে দানা বাঁধছিল এবং মানুষ এই ভ্রান্তিতে ছিল যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর যাবতীয় কর্মপদ্ধতি বা আমল শরীয়তের অংশ। এই কারণেই যদি কোন মৌলবী কারোর পায়জামা গোড়ালির নীচে দেখলেই বলে ওঠে এ কাফের।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ভ্রান্তিটিকে দূর করে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি কয়েক প্রকারের। এক প্রকার কর্মপদ্ধতি যা তিনি সর্বদা বিনাব্যতিক্রমে করতেন এবং অপরকেও তিনি এমনটি করার আদেশ দিয়েছেন। সেগুলি পালন করা কর্তব্য। দ্বিতীয়ত ঐ সকল কর্মপদ্ধতি রয়েছে যেগুলি তিনি (সা.) করতেন এবং অপরকে করার উপদেশও দিতেন সেগুলি হল সুন্নত। তৃতীয়তঃ ঐ সকল কর্মপদ্ধতি যেগুলি তিনি (সা.) করতেন এবং যদি তোমরা এগুলি করতে পার তবে তোমাদের জন্য উত্তম। এগুলি করা ভাল। চতুর্থঃ ঐ সকল আমল যা তিনি বিভিন্ন উপায়ে করেছেন, সবগুলির অনুসরণ করাই বৈধ। পঞ্চম ঐ সকল কর্মপদ্ধতি যেগুলি পানাহারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এগুলি সম্পর্কে তিনি কাউকে কোন নির্দেশ দেন নি। তিনি (সা.) এক্ষেত্রে আরবদের প্রথা অবলম্বন করেছেন। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের মানুষ নিজের দেশের প্রথা মেনে চলতে পারে।

(৪) চতুর্থ যে ভুল ছিল সেটি হল কিছু মানুষের কাছে শরীয়ত কেবল ঐশী গ্রন্থ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। নবীর সঙ্গে শরীয়তের কোন সম্পর্ক আছে বলে তারা মনে করত না। যেরূপ চাকডালবী দাবি করত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই প্রসঙ্গে বলেন শরীয়তের দুইটি অংশ। (১) একটি নীতিগত অংশ যার উপর ধর্মীয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্ভর করে। (২) দ্বিতীয় অংশ হল আংশিক ব্যাখ্যা এবং বৌদ্ধিক বিবরণ।এই কাজটি খোদা তা'লা নবীদের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন যাতে নবীদের সঙ্গেও মানুষের সম্পর্ক তৈরী হয় এবং তারা মানুষের জন্য আদর্শ হয়। অতএব, নবীর ব্যাখাও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত সম্পর্কিত সংশোধন

নবম কাজ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল, তিনি ইবাদতের সংশোধন করেছেন। এই সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল সেগুলি হল- (১) ইবাদতের সম্পর্ক কেবল মনের সাথে, শরীরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- ইবাদতের সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে আর আত্মার সম্পর্ক দেহের সঙ্গে। যদি দেহকে ইবাদতের কাজে না লাগাও তবে অন্তরে সেই আবেগ ও উচ্ছাস সৃষ্টি হবে না। অতএব, দৈহিক ইবাদতকে নিরর্থক মনে করা মারাত্মক ভুল। ইবাদতের দর্শন না বোঝার কারণেই এমন ধারণার জন্ম হয়।

(২) মানুষ যে দ্বিতীয় প্রকারের বিভ্রান্তিতে ছিল তা হল, তারা নামাযে দোয়া করতে ভুলে গিয়েছিল। সন্নীদের মধ্যে নামাযে দোয়া করা যেন কুফরের পর্যায়ের অপরাধ বলে মনে করা হতো। তাদের ধারণা ছিল, নামায শেষ করার পর, হাত তুলে দোয়া করা আবশ্যিক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: দোয়া নামাযের মধ্যে করাই বাঞ্ছনীয় এবং নিজের ভাষাতেও করা উচিত যাতে উচ্ছাস সৃষ্টি হয়।

(৩) কিছু মানুষ মনে করত যে, বাহ্যিক ইবাদতই যথেষ্ট। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- বাহ্যিক ইবাদত হল আধ্যাত্মিক পবিত্রততার মাধ্যম। অতএব অন্তরের পবিত্রতা অর্জন কর যেটি অর্জন করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ফিকাহ্‌র সংশোধন

১০ম কাজ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল, ফিকাহ্‌র সংশোধন যার মধ্যে যারপরনায় বিকৃতি ঘটেছিল। এবং সীমাহীন মতানৈক্যের সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি (আ.) এর জন্য কিছু মূল্যবান নীতি প্রণয়ন করেন এবং বলেন, শরীয়তের ভিত্তি নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) কুরআন মজীদ (২) মহানবী (সা.)-এর সুন্নত (৩) এমন হাদীস কুরআন, সুন্নত এবং যুক্তির বিপক্ষে যায় না। (৪) ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা হাদীস ও সুন্নতকে পৃথক করা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর এটি একটি অসাধারণ কীর্তি। তিনি (আ.) বলেন সুন্নত হল রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই কর্মপদ্ধতি যার উপর তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন এবং অপরকেও সেই কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। অপরপক্ষে হাদিস হল মহানবী (সা.)-এর বাণী যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

একাদশতম কাজ যেটি তিনি (আ.) করেছেন সেটি হল নারীজাতির অধিকারকে প্রতিষ্ঠত করেছেন যা তাঁর (আ.) আবির্ভাবের পূর্বে সম্পূর্ণ রূপে হরণ করা হত। যেমন- উত্তরাধিকার পাওয়া যেত না (২) পর্দার বিষয়ে কঠোরত অবলম্বন করা হত। চলাফেরাতেও বাধা-নিষেধ আরোপ করা হত। (৩) শিক্ষার্জন করা থেকে বঞ্চিত রাখা হত। (৪) তাদের সঙ্গে সদাচার করা হত না। (৫) নিকাহর বিষয়ে কোন অধিকার তাদেরকে দেওয়া হত না। (৬)খুলা ও তালাকের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হত। (৭) নারীদের ক্ষেত্রে মানবাধিকারে বিষয়টিকে গ্রাহ্য করা হত না। তিনি (আ.) এই সমস্ত বিষয়ের সংশোধ করেন।

মানুষের আমল বা কর্মপদ্ধতির সংশোধন

দ্বাদশতম কাজ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল, মানুষের কর্মপদ্ধতি বা আমলের সংশোধন করেছেন যার উপর নাজাত বা মুক্তি নির্ভর করে। খৃষ্ট মতবাদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পাপ সূত্র উপস্থাপন করে বলেছিল যে, যেহেতু মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পাপের অংশীদার হয়ে থাকে এই

কারণে কোন মানুষই পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে না। অর্থাৎ তাদের মতে মানুষের সংশোধন সম্ভব নয়। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য তারা 'কাফফারা' বা প্রায়ঃশ্চিত্ত মতবাদ উদ্ভাবন করেছিল।

হিন্দু ধর্ম মানুষের সংশোধনকে অসম্ভব বলে ব্যাখ্যা করে মানুষকে পুনঃজন্মের আবর্তে নিক্ষিপ্ত করেছিল।

ইহুদীরা আত্ম-সংশোধনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছিল। কেননা তাদের নিকট নবীরাও পাপ করতে পারে এবং হয়ে থাকে। তারা বেশ আনন্দের ছলে নবীদের পাপ গণনা করত এবং এর মধ্যে কোন ত্রুটি দেখত না। তাদের নিকট মুক্তির একমাত্র উপায় হল আল্লাহ তা'লা কাউকে যদি তাঁর প্রিয়ভাজন বলে গণ্য করে তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নাজাত লাভ সম্ভব। অর্থাৎ নাজাতকে তারা ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত এমন আমল মনে করত এবং নিজেদের নাজাতের বিষয়ে এই কারণে সন্তুষ্ট ছিল যে, তারা ইব্রাহিমের বংশধর এবং মুসার অনুসারী। এই কারণে নয় যে, তারা আত্ম-সংশোধনের মাধ্যমে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে ফেলেছে।

মুসলমানরাও ফিরিশতা এবং নবীদেরকে পাপের সঙ্গে জড়িয়ে ইহুদীদের অনুকরণ করে সেই উদ্দেশ্যটিকে হত্যা করেছিল। এবং তারা এই মিথ্যা রচনা করে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) সমস্ত মুসলমানদের সুপারিশ করবেন এবং সকলকে ক্ষমা করা হবে। এর থেকেও ভয়ানক আরও কিছু ঘটছিল। আর সেটি হল তারা রসুলুল্লাহ (সা.)- কে ছাড়াও আরও এমন পীর বানিয়ে রেখেছিল এবং সেই পীর তাদেরকে বলত যে, কিছু করার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদেরকে সরাসরি জান্নাতে পৌঁছে দিব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সকল ধারণার ভুলগুলিকে প্রমাণ করেন এবং কুরআন করীম থেকে নাজাতের উপায় বলে দেন। এবং যার উপর নাজাত নির্ভর করে সেই পূর্ণ আত্ম-সংশোধনের উপায় উপস্থাপন করেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, বস্তুতঃ সমস্ত জাতি এই ভ্রান্তিতে নিপতিত যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই পাপী। কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে পাপের ভাগী হয়, তো কেউ আবার পুরোনো কর্মের কারণে , আবার কেউ 'মানুষকে যেহেতু দূর্বল প্রকৃতি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে' আয়াতের অধীনে, কেউ অটল তকদীরের ধারণার বশবর্তী হয়ে এই কুমন্ত্রনার শিকার হয়। অথচ প্রকৃত বিষয় হল , উত্তরাধিকার ধারার প্রভাব থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য প্রকৃতিকে পুণ্যের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের প্রকৃতিতে মন্দ-কর্মকে ঘৃণা করা এবং পুণ্যকর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখা হয়েছে। বাকি সব কিছু মরিচা হয়ে থাকে যেগুলি স্তরে স্তরে জমা হয়ে থাকে। এর প্রমাণ হল, দুরাচারীরাও পুণ্যকর্ম বেশি করে থাকে। একজন ব্যক্তি যাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়ে থাকে, যদি সে কয়েকটি মিথ্যা কথা সারা দিনে বলে তবে তার থেকে অনেক বেশি সত্য কথাা সে পুরো দিনে বলবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সমস্ত মন্দের মূল হল মানুষের মন থেকে পবিত্রতা অর্জন করার আশা বের করে দেওয়া এবং তাকে নিজেকে নিজের দৃষ্টিতে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে অনাদি কাল থেকে ক্রমাগত অপরাধী অপবাদ দেওয়া মাধ্যমে এমন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোন ছেলেকে অকারণে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু কর তবে কিছুকাল পরে সত্যি সত্যিই মিথ্যা কথা বলা আরম্ভ করবে। তিনি (আ.) বলেন- মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে পুণ্যবান সৃষ্টি করা হয়েছে। পাপ মরিচা মাত্র। যে প্রকৃতি দিয়ে সে তৈরী সেটি হল পুণ্য। তাকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করা আবশ্যক যাতে তার মধ্যে সাহস সৃষ্টি হয় এবং নিরাশা দূরীভুত হয়। একটি পবিত্র উৎসের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষন কর। এইভাবে সে নিজে নিজেই পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে।

ইসলাম এবং মুসলমানদের উন্নতির উপকরন

ত্রয়োদশতম কাজ যেটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল তিনি ইসলাম এবং মুসলমানদের উন্নতির উপায়-উপকরণ তৈরী করেছেন। যেগুলি হল-

(১) ইসলামের তবলীগ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হলেন প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি এই কাজটির সূচনা করেন যা দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধ হয়েছিল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমানরা তবলীগ ও প্রচারের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিল। নিজের আশপাশের মানুষজনকে হয়তো তবলীগ করা হল। ব্যস ওই টুকুই। কিন্তু তবলীগকে যথারীতি কাজ ও দায়িত্ব হিসেবে পালন করা মুসলমানদের মস্তিষ্কেই ছিল না এবং খৃষ্টান দেশগুলিতে তবলীগ করা তাদের নিকট একেবারে অসম্ভব ছিল। তিনি (আ.) ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময় এই কাজের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং সর্বপ্রথম পত্রের মাধ্যমে এবং পরে ইশতেহারের মাধ্যমে ইউরোপের মানুষকে ইসলামের মোকাবিলার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এবং বলেন যে, ইসলাম নিজ সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে সমস্ত ধর্মের থেকে উৎকৃষ্ট। যদি কোন ধর্মের সাহস থাকে তবে সে মোকাবিলায় এগিয়ে আসুক। মিঃ আলেকজান্ডার দিব আমেরিকার প্রসিদ্ধ মুসলিম মিশনারী তাঁর (আ.) লেখনী পড়েই মুসলমান হন এবং তিনি ভারতে তাঁর (সা.) সাক্ষাতের জন্যই আগমণ করেছিলেন কিন্তু অন্যান্য মুসলমানরা তাকে প্ররোচিত করে যে, মির্যা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে অন্যান্য মুসলমানেরা ক্ষুণ্ন হবে এবং আপনার কাজে কোন সাহায্য করবে না। আমেরিকা ফিরে গিয়ে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং আমৃত্যু তিনি বিভিন্ন চিঠির মাধ্যমে নিজের এই ভুলের জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত করতে থাকেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের তবলীগের জন্য তা৭র জামাতের পক্ষ থেকে মিশন কাজ করে চলেছে। এবং বিচিত্র বিষয় এই যে, আজ ৬০ বছর পর কেবল তাঁরই জামাত এই কাজটি করে চলেছে।

(২) দ্বিতীয়ত তিনি জিহাদের সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন করেন। মানুষ এই ভ্রান্তিতে আছে তিনি কেন জিহাদ থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ তিনি (আ.) কখনো জিহাদ থেকে নিষেধ করেন নি। বরং তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, মুসলমানরা প্রকৃত জিহাদকে ভুলে বসেছে এবং তারা কেবল তরবারী চালনাকে জিহাদ মনে করে এসেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জিহাদের সংজ্ঞা এই রূপ দিয়েছেন যে, জিহাদ হলে প্রত্যেক এমন কর্মের নাম যা মানুষ পুণ্য এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে থাকে, আর এই কাজ যেভাবে তরবারীর মাধ্যমে হয় অনুরূপে আত্ম-সংশোধনের মাধ্যমেও হয়ে থাকে এবং তবলীগের মাধ্যমেও হয়ে থাকে, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেও হয়ে

থাকে এবং প্রত্যেক প্রকারের জিহাদ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি মুসলমানরা মসীহ মওউদ (আ.)-এর দেওয়া জিহাদ সম্পর্কিত এই সংজ্ঞা জানত তবে আজ এই দুর্দিন দেখতে হতো না। যদি তারা জিহাদের পরিভাষা ও তাৎপর্য অনুধানব করতে সক্ষম হত তবে ইসলামের বাহ্যিক বিজয়ের সময়ে জিহাদের আদেশকে রহিত বলে মনে করত না বরং তাদের স্মরণ থাকত যে, কেবল এক প্রকারের জিহাদ শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদগুলি এখনও অব্যাহত রয়েছে আর এখন তবলীগের জিহাদ শুরু করার বেশি সুযোগ। এরফলে ইসলাম কেবল ইসলামী দেশসমূহেই বিস্তৃত হত না বরং আজ ইউরোপও মুসলমান হত এবং এর উন্নতির পাশাপাশি ইসলামের এই পতন ঘটত না। মোটকথা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে জিহাদের কথা বলেছেন। তিনি একথা বলেন নি যে তরবারীর যুদ্ধ নিষিদ্ধ বরং তিনি বর্তমান যুগে শরীয়ত অনুযায়ী কোন প্রকারের জিহাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে কথা বলেছেন। শুধু তাই নয় তিনি স্বয়ং বীর-বিক্রমে এই জিহাদের পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং সমগ্র বিশ্বে তবলীগের কাজের সূচনা করেছেন। আজকেও যদি মুসলমানরা তবলীগের জিহাদ শুরু করে দেয় তবে তারা সফল হবে। মুসলমানরা এই বিষয়টি যদি উপলব্ধি করে তবে এটি তাঁর (আ.) এই কাজটি ইসলামের এক অসাধারণ খিদমত।

(৩) ইসলামের উন্নতির জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে তৃতীয় কাজটি করেছেন সেটি হল নতুন জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরী করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মীয় যুদ্ধগুলি গেরিলা যুদ্ধ সদৃশ ছিল। কেউ না কেউ হঠাৎ করে একটি ধর্মীয় প্রসঙ্গ নিয়ে আপত্তি শুরু করে দিত এবং প্রতিপক্ষকে অপদস্ত করার চেষ্টা করত। তিনি (আ.) এই ত্রুটির সংশোধন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, নিম্নোক্ত নীতির ভিত্তিতে ধর্মকে যাচাই করা উচিত।

(ক) সাক্ষ্য-প্রমাণ। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার প্রমাণ দেওয়া। একথার প্রমাণ দিতে হবে যে, সেই ধর্মের পথ ধরে সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব যে উদ্দেশ্যটিকে পূর্ণ করা ঐ ধর্মের কাজ। যেমন- সেই ধর্মের উদ্দেশ্য যদি খোদার নৈকট্য অর্জন করা হয়, বস্তুতঃ প্রত্যেক ধর্মের এটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তার উচিত একথা প্রমাণ করা যে, সেই ধর্মের পথ অনুসরণকারীরা খোদার নৈকট্য অর্জন করে।

(খ) দ্বিতীয় নীতি ধর্মীয় 'মোবাহেসা' (তর্ক-সভা) সম্পর্কে তিনি (আ.) যেটি উপস্থাপন করেন সেটি হল, দাবী ও প্রমাণ দুটিই যেন ঐশী গ্রন্থে বিদ্যমান থাকে। তিনি (আ.) এদিকে ধর্মীয় জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, বর্তমান যুগে একটি বিচিত্র প্রথা আরম্ভ হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজের ধর্মের নাম দিয়ে চালিয়ে তার উপর তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করে দিচ্ছে। এর ফল যা দাঁড়াচ্ছে সেটি হল, না তার জয় তার ধর্মের জয় বলে বিবেচ্য হতে পারে আর না তার পরাজয় তার ধর্মের পরাজয় বলে বিবেচ্য হতে পারে। এইভাবে মানুষ নিরর্থক ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কে তাদের সময় অপচয় করছে, তা কোন উপকারে আসছে না। অতএব যে দাবি পেশ করা হবে তার সম্পর্কে যেন প্রমাণ করা হয় যে সেটি উক্ত ধর্মের ঐশী গ্রন্থে বিদ্যমান আছে এবং দলিলও যেন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয় কেননা খোদা তা'লার কালাম যুক্তিহীন হতে পারে না। ধর্মীয় মোবাহেসার সময় এটি আবশ্যক করা উচিত। তবে হ্যাঁ, বিশদ ব্যাখ্যার সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর এই নীতি ধর্মীয় জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়।

(গ) তৃতীয় যে নীতি তিনি (আ.) উপস্থাপন করেন সেটি হল, প্রত্যেক ধর্ম যা বিশ্ব ধর্ম হওয়ার দাবী করে, তার জন্য নিজের মধ্যে উত্তম শিক্ষা আছে কিনা সেটি প্রমাণ করাই যথেষ্ট হবে না বরং তার শিক্ষা প্রত্যেক প্রকৃতির মানুষের জন্য সন্তুষ্টি জনক এবং বাস্তব প্রয়োজনের চাহিদা পুরণকারী কিনা তা বিশ্ব-ধর্ম হওয়ার জন্য প্রমাণ করা জরুরী।

(৪) ইসলামের উন্নতির জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) চতুর্থ যে কাজটি করেছেন সেটি হল, ভারতের একটি উদ্যমী জাতি শিখ জাতিকে ইসলামের নিকটতর করেন। তিনি (আ.) ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং শিখদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী থেকে প্রমাণ করে দেখান যে, শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক (রহ.) সাধারণত মুসলমান পীরদের সঙ্গে এবং বাবা ফরিদ (রহ.)-এর সঙ্গে ভক্তি ও ভালবাসা রাখতেন। এই গবেষণা এমন অসাধারণ ও নির্ভরযোগ্য যে, একটি শ্রেণীর উপর এই গবেষণার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শীঘ্র হোক বা বিলম্বে এই পদক্ষেপ অসাধারণ পরিণাম সৃষ্টি করার কারণ হবে।

(৫) ইসলামের উন্নতির জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে পঞ্চম কাজটি করেন সেটি হল, আরবী ভাষাকে তিনি 'উম্মুল আলসিসনা' (ভাষার জননী) প্রমাণ করেন এবং মুসলমানদের আরবী ভাষা শেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলমানরা এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি।

(৬) ইসলামের উন্নতির জন্য ষষ্ঠ কাজ যেটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল তিনি ইসলামের সমর্থনের জন্য দলিল-প্রমাণেরএকটি বিশাল ভাণ্ডার তৈরী করেন। আধুনিক শিক্ষার অপব্যবহারের কারণে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে থাকে সেগুলির মোকাবেলার জন্য তাঁর রচিত পুস্তকাবলীর সাহায্যে এখন প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির মানুষের জন্য সৌকর্য সৃষ্টি হয়েছে।

(৭) সপ্তম কাজ যেটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) করেছেন সেটি হল নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলমান জাতির মধ্যে পুণরায় নতুন আশার সঞ্চার করেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমান জাতি সম্পূর্ণ রূপে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং ধারণা করে বসেছিল যে, ইসলাম রবি এখন অস্তমিত। তিনি (আ.) এসে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমার মাধ্যমে ইসলামের উন্নতি সাধন হবে এবং ইসলাম প্রথমতঃ দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে এবং অবশেষে তবলীগের মাধ্যমে শক্তিধর জাতিগুলি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। অনুরূপভাবে তিনি বিদীর্ণ হৃদয়গুলির মধ্যে সাহস সঞ্চার করেন। অসহায়দের অবলম্বন প্রদান করেন। বিধ্বস্ত মনকে শান্তনা প্রদান করেন, শুকিয়ে যাওয়া শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন আশা অসাধারণভাবে শক্তিশালী হয় তখন অনেক অসাধ্য সাধন করে ফেলে। আশার পরিণামেই ত্যাগ ও তিতীক্ষার প্রেরণা জন্মায়। যেহেতু

মুসলমানদের মধ্যে নিরাশা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই কারনে তাদের মধ্যে থেকে কুরবানী ও ত্যাগের প্রেরণাও হারিয়ে গিয়েছিল। আহমদীদের মধ্যে আশা আছে, এই কারণে কুরবানীও আছে।

বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা

বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর আরও একটি কাজ। এই উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) তিনি কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যেগুলিকে বাস্তবায়িত করলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(১) পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যে সব থেকে বড় কারণ হল মানুষ অন্য ধর্মের সম্মানীয় মহাপুরুষদের অসম্মান করে এবং সেই ভিন্ন ধর্মের সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করে। যদিও সুস্থ বিবেক এবিষয়টিকে স্বীকার করতে পারে না যে, খোদা তা'লা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক, তিনি কোন নির্দিষ্ট জাতিকে নির্বাচন করে পথ-প্রদর্শন করবেন এবং অন্যদেরকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে রাখবেন। বিবেক যা-ই বলুক না কেন, পৃথিবীতে এই ধারণাটি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর কারণে ঘোর নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সত্যকে জগতের সামনে উদঘাটন করেন। এবং জোরালোভাবে দাবি করেন যে, প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হয়েছে। এইরূপে তিনি (আ.) অশান্তি ও নৈরাজ্যের একটি বিরাট কারণকে সমূলে উৎপাটন করেন।

(২) কিছু মানুষের ধারণা ছিল যে, তাদের ধর্মের প্রবর্তনকারীর আগমণের পূর্বে পৃথিবীর পথ-প্রদর্শনের দরজা বন্ধ ছিল, তাদের আগমণের পর সেই দ্বার উন্মুক্ত হয়। খৃষ্টানরা এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে হযরত মসীহ নাসেরীর মাধশ্যে সমগ্র বিশ্বের পথ-প্রদর্শন হয়েছে।

(৩) কিছু মানষের ধারণা ছিল যে, কোন জাতির পথ-প্রদর্শন সেই জাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্য জাতির বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাও নাজাত (মুক্তি) অর্জন করতে পারে যদি তারা বিশেষ চেষ্টা করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই মতবাদে বিশ্বাসী।

যদিও কুরআন করীম এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও মুসলমানদের চিন্তা ধারাও অভিন্ন ছিল।

এই ধরণের চিন্তাধারার ফলাফল যা দাঁড়াল তা হল, বিভিন্ন জাতির মধ্যে চুক্তি ও মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকই হঠকারীতা প্রদর্শন করে এই দাবি করছিল যে, তারাই 'নাজাত' (মুক্তি) লাভ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ 'নাজাত' পেতে পারে না। কিছু মানুষ অন্যদের মহাপুরুষদেরকেও মেনে নিত, কিন্তু একজন সংস্কারক ও শিক্ষক হিসেবে নয় বরং একজন সম্মানীয় ব্যক্তি বা যোদ্ধা হিসেবে যারা নিজের শক্তিবলে উন্নতি করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেন।

* তিনি (আ.) সূর্য ও তার কিরণ, পানি ও তার প্রভাব পর্যক্ষেণ করে বলেন যে, যে খোদা মানবজাতিকে এই সমস্ত বস্তুগুলির ক্ষেত্রে সম্মিলিতরূপে সৃষ্টিকে করেছেন তিনি হিদায়াতের ক্ষেত্রে তারতম্য করতে পারেন না। এবং বলেন যে, নীতিগতভাবে সমস্ত জাতির মধ্যেই নবী থাকা আবশ্যক । যেমন তিনি হযরত কৃষ্ণকে কেবল এই কারণেই নবীরূপে স্বীকার করেন নি যে, তিনি একজন সম্মানীয় মহাপুরুষ ছিলেন বরং এই কারণে যে, তিনি (আ.) খোদা তা'লার গুণাবলীকে গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এমন খোদা হওয়া সম্ভব নয় যিনি হিন্দু জাতিকে ভুলে যাবেন এবং তাদের পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না।

* দ্বিতীয়ত তিনি (আ.) মনুষ্য প্রকৃতি ও এবং এর শক্তিসমূহকে পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়ভরে বলে ওঠেন যে, এই মনি-মানিক্য কখনো বিনষ্ট হতে পারে না, খোদা তা'লা এটিকে অব্যশই গ্রহণ করে থাকবেন এবং আলেকিত করার উপকরণ সৃষ্টি করে থাকবেন।

মোটকথা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং তাঁর সিদ্ধান্ত কতিপয় জবর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিণাম ছিল না। বরং তা ছিল খোদার মহত্ব এবং মানবীয় যোগ্যতা ও পবিত্রতা ভিত্তি করে।

এখন চুক্তির পথ উন্মুক্ত হল। কোন হিন্দু এ কথা বলতে পারে না যে, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে আমার নিজেদের সম্মানীয় পুরুষগণকে দোষারোপ করতে হবে, কেননা, ইসলাম তাদেরকেও বুযুর্গ ও সম্মানীয় রূপে অভিহিত করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা এই নীতিরই অনুসরণ করবে।

* বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করেছিলেন সেটি হল তিনি প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে নিজের ধর্মের সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী উপস্থাপন করার আহ্বান করার প্রস্তাব দেন। তিনি (আ.) বলেন অন্য ধর্মের উপর আপত্তি উত্থাপন করো না, কেননা, অন্যের ধর্মের ত্রুটি বার করলে নিজের ধর্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না। বরং অন্য ধর্মের মানুষের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সঞ্চার হয়।

* বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তৃতীয় যে নীতি প্রস্তাব করেন সেটি হল এই যে, নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের মাধ্যমে যেন দেশের উন্নতি কামনা না করা হয়। বরং শান্তিপূর্ণভাবে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগীতার মাধ্যমে এর জন্য চেষ্টা করা থাকা উচিত। কিন্তু সহযোগিতার অর্থ তোষামোদ করা নয়, বরং সেটি ভিন্ন বস্তু, এবং সহযোগতী ভিন্ন বস্তু যা প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি সহজে বুঝতে পারে। তোষামোদ এবং পদের লালসা দেশকে বিপন্ন করে তোলে এবং পরাধীনতাকে স্থায়ী করে দেয়। কিন্তু সহযোগীতা স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর করে।

(১) কিছু মানুষের ধারণা ছিল যে, নাজাত বা মুক্তি হল অনুভুতিহীনতার নাম। যেরূপ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ধারণা করত। (২) কিছু মানুষ মনে করত খোদার সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়ার নামই হল নাজাত। সনাতন হিন্দুরা এই মতবাদেই বিশ্বাসী। (৩) কিছু মানুষের ধারণা ছিল, নাজাত হল বস্তু থেকে পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মার স্বাধীন হয়ে যাওয়া। জৈন ধর্মাবলম্বীরা এই ধারণাই পোষণ করত। (৪) কিছু মানুষ মনে করত, নাজাত অস্থায়ী এবং সাময়িক। যেমন -আর্য সমাজীরা। (৫) কিছু মানুষের ধারণা ছিল বিচার দিবস কেবল আধ্যাত্মিক, যেমন-আধ্যাত্মিকবাদীরা। (৬) কিছু মানুষ ধারণা করত বিচার দিবস সম্পূর্ণরূপে দৈহিক। যেমন- ইহুদী এবং মুসলমান। (৭) কিছু মানুষের ধারণা ছিল দোযখ দৈহিক এবং এবং জান্নাত আধ্যাত্মিক। যেমন- খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা। (৮) কিছু মানুষের ধারণা ছিল

দোযখের শাস্তি জান্নাতের পুরস্কারের ন্যায় চিরস্থায়ী।

কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং সংশয় সৃষ্টিকারী ছিল। যদি অনুভুতিহীনতার নাম নাজাত হয় তবে খোদা তা'লা মানুষকে সৃষ্টিই বা কেন করলেন? সেই বস্তুকে সৃষ্টি করা হয় যাকে পরবর্তীতে অর্জন করা যায়। অনুভুতিহীনতা তো সৃষ্টির পূর্বেই বিরাজ করছিল। তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ছিল? অনুরূপভাবে খোদার সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়ারই নাম যদি নাজাত হয় তবে এটি পুরস্কার কীভাবে হল। বিলীন হয়ে যাওয়া পৃথক হোক বা খোদার সত্তায় হোক। অনুভুতিযুক্ত একটি সত্তার জন্য এটিকে পুরস্কার বলা যায় না। যদি বস্তু থেকে মুক্তির নাম নাজাত হয়ে থাকে তবে আত্মাগুলিকে কেন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করানো হল। সৃষ্টিকে নতুনভাবে শুরু করার উদ্দেশ্য কি ছিল? অনুরূপভাবে শাস্তি-ও পুরস্কার দান কেবলই আধ্যাত্মিক হওয়ার অবধারণাটিও ভুল। কেননা, মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য হল তার মধ্যে বাইরের প্রভাবকে গ্রহণ করার প্রবণতা। এবং মনুষ্য-প্রকৃতি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় আনন্দই উপভোগ করতে চায়। অনুরূপভাবে যারা বলে যে, শাস্তি ও পুরস্কার দান কেবল বাহ্যিক, তাদের দাবিও ভুল। মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন কেবল এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, সে কেবল পানাহার করে উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করবে- এমনটি কি হতে পারে?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সকল ভ্রান্ত ধারণাগুলির খণ্ডন করেন এবং নিম্নোক্ত সত্য উপস্থাপন করেন। তিনি (আ.) বলেন: মানুষের উদ্দেশ্য নাজাত নয় বরং সফলতা। নাজাতের অর্থ হল পরিত্রাণ লাভ করা। পরিত্রাণ নাস্তি-কে বোঝায়। আর নাস্তি কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। অতএব মানুষের উদ্দেশ্য হল সফলতা অর্জন এবং সফলতার অর্থ কোন কিছু হারানো নয় বরং অর্জন করা। আর যখন কোন কিছু অর্জন করার নাম সফলতা হয়, তখন পরকালে মানুষের অনুভুতি আরও প্রখর হওয়া আব্যশক যাতে সে বেশি পরিমাণে অর্জন করতে পারে। এই কারণেই মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে খোদা তা'লার চারটি মৌলিক গুণাবলী মানুষের জন্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। পরকালে 'আরশ' আটটি মৌলিক গুণাবলী প্রকাশ করবে। অর্থাৎ এই পৃথিবীর তুলনায় পরকালে ঐশী বিকাশ অনেক গুণ বেশি হবে।

এর পর তিনি (আ.) প্রমাণ করেন যে, নাজাত বা সফলতা চিরস্থায়ী এবং তিনি বলেন যে, কর্মের প্রতিদান কর্মসম্পাদনকারীর নিয়্যত এবং প্রতিদান দাতার শক্তির উপর নির্ভর করে। এই দুটি বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে এবং মনুষ্য প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে সফলতার চিরস্থায়ীত্ব প্রমাণ হয়, যা ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে চায়।

অনুরূপভাবে তিনি (আ.) একথাও বলেন যে, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান কেবল আধ্যাত্মিকও নয় আবার কেবল দৈহিকও নয়। আবার এদের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক ও অপরটি দৈহিক - এমনটিও নয়। কেননা, পুণ্য কর্ম এবং পাপের কেন্দ্র একটিই । তাই শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের পদ্ধতিও একটিই হওয়া উচিত। যেহেতু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন প্রেরণা লাভের পর পূর্ণ অনুভুতি অর্জিত হয়, এই কারণে শাস্তি ও পুরস্কার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দুই প্রকারের অনুভুতির সমন্বয়ে হবে। আর যেহেতু সেই জগত অধিক প্রখর অনুভুতির স্থান হবে, এই কারণে সেখানকার শাস্তি ও পুরস্কারের প্রয়োজন অনুসারে একটি নতুন দেহ দেওয়া হবে। সেখানে অবশ্যই এই দেহ থাকবে না, কিন্তু দেহ অবশ্যই থাকবে। অর্থাৎ নতুন দেহ প্রদান করা হবে যা এখানকার তুলনায় আধ্যাত্মিক হবে। ইহজগতের ইবাদতসমূহ সেখানে বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশিত হবে। সেগুলির বাহ্যিকরূপ থাকলেও সেগুলি কোন পার্থিব বস্তু দ্বারা গঠিত হবে না। অর্থাৎ সেখানে ফল, দুধ, মধু এবং স্থানসমূহ অবশ্যই থাকবে কিন্তু তা ভিনন্ন প্রকারের, ইহজাগতিক বস্তুর সঙ্গে সেগুলির কোন সাদৃশ্য থাকবে না। বরং একটি সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা গঠিত হবে সূক্ষতা অনুসারে যেগুলিকে এই দুনিয়ার তুলনায় আধ্যাত্মিক দেহ বলা যেতে পারে।

পরিশেষে আমি একথা বলতে চাই যে, যদি কেউ বলে যে কুরআন করীমে সমস্ত কথার ছিল। মির্যা সাহেব নতুন আর কি করেছে? এই বিষয়গুলি প্রকাশ করায় তাঁর কাজ কিভাবে প্রমাণিত হল? এর উত্তর হল, যদি কোন অ-মুসলিম একথা বলে যে, সমস্ত কিছু তো খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন। মহম্মদ (সা.) কি কাজ করেছেন- তবে কি তোমরা একথা বলবে না যে নিঃসন্দেহে তিনি (সা.) যা কিছু পৃথিবীকে বলেছেন সেগুলি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এগুলি অন্য কেউ প্রাপ্ত হয় নি? কেননা, তিনি (সা.) নেকী, তাকওয়া এবং কুরবানীর ক্ষেত্রে এমন বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যা অন্য কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। এই কারণেই খোদা তা'লা তাঁর উপর এই জ্ঞান-ভান্ডার উন্মোচন করেছেন। অতএব ঐ সকল কাজ তাঁর(সা.)-এর বলে গণ্য হবে। আমরাও এই উত্তরই দিব। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত কিছু কুরআন মজীদে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তা সত্বেও এগুলি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নি এবং খোদা তা'লা এই জ্ঞান-ভান্ডার অন্য কারোর উপর উন্মোচন করেন নি বরং তাঁর (আ.)-এর উন্মোচন করেছেন এবং তা এমন সময় যখন কুরআন শরীফ থেকে মানুষ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছিল। অতএব, যদিও এই জ্ঞান-ভান্ডার কুরআনে মজুদ ছিল কিন্তু তা সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। খোদা তা'লা সেই পর্দা উন্মোচনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে নির্বাচন করেন, এই কারণে এটি তাঁরই কীর্তিরূপে গণ্য হবে।

আমি তাঁর (আ.) পনেরোটি কাজ বর্ণনা করেছি, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর কাজ এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর কাজ বহুল ব্যাপক ও বিস্তৃত আর যা কিছু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এগুলি নীতিগত আর এক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যদি তাঁর সমস্ত কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় তাবে তার সংখ্যা হাজার অতিক্রম করবে। আমার মতে কোন কেউ যদি সেগুলিকে পুস্তক আকারে একত্রিত করে তবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই মনবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব যা তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশ করেছেন। সেটি হল এই যে, এই পুস্তকে তিনি ইসলামের তিন শত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই প্রতিশ্রুতি নিজের বিভিন্ন পুস্তকের মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। তিনি (আ.) তাঁর পুস্তকাবলীতে ইসলামের তিনশ'র অধিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যেগুলি প্রমাণ করার জন্য আমি প্রস্তুত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়।

সৃষ্টির উন্মেষলগ্ন থেকেই ঐশী-ফলক এবং আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ তকদীরের পাতায় উল্লেখিত ছিল যে, ইসলাম ও কুফর- ভিন্ন বাক্যে বিশ্ব-ব্যাপী সত্য ও অসত্যের মহান ও শেষ যুদ্ধ মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে সংঘটিত হবে এবং মসীহ্ মওউদ-এর মাধ্যমে ইসলামের বিজয় হবে।

আমাদের নবী হযরত খাতামুল আম্বিয় মহম্মদ (সা.)-এর কল্যাণ ধারা এখন চিরতরে অব্যাহত। তিনি (সা.) ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু মৃত্যুর পরেও তাঁর কল্যাণ ধারা ব্যহত হয় নি। মৃত্যুর পরে পরেই খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয় যা ৩০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অতঃপর মুসলমান জাতির সংস্কার ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) এবং আওলিয়া প্রেরণ করতে থাকেন। এবং অবশেষে চোদ্দ শতাব্দীর শিরোভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পূর্ণরূপ প্রতিচ্ছায়া হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আা.)কে ভারতের পাঞ্জাবের একটি অখ্যাত গ্রাম কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন যার মাধ্যমে ইলামের বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হল। ইসলামের বুযুর্গগণ একথা স্বীকার করেন যে, ইসলামের বিজয় প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রতিশ্রুত জাতির আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এটি একটি শাশ্বত সত্য যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষগণ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন এবং তার বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়। আল্লাহ্ তালার তকদীর অনুযায়ী অনুরূপ আচরণ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীদের সঙ্গে হওয়াও ভবিতব্য। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দলিল-প্রমাণের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বিজয় লাভ করেছেন এবং বিশ্ব-ব্যাপী গ্রহণীয়তার লক্ষণ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সুধী পাঠক বর্গ! আমার এই প্রবন্ধটির বিষয় হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয় লাভ। এই প্রসঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর পুস্তক দাওয়াতুল আমীরে যে দলিল-প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা যথোচিত মনে করি।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: " হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার পক্ষে চতুর্থ দলিল বা বলা যেতে পারে যে চতুর্থ প্রকারের দলিল হল, তাঁর (আ.) হাতে আল্লাহ্ তা'লা সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন যেটিকে কুরআন করীমে মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিশেষ কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) হাতে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করে দেখান। কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লা বলেন "তিনিই রসুলকে হিদায়ত এবং সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি এই ধর্মকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেখান। (আল-ফাতাহ: ২৯) রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী থেকে জানা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে পূর্ণ হবে। কেননা, দাজ্জালের ফিতনা, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং খৃষ্টবাদকে ধ্বংস করার কাজ তিনি মসীহ্র উপরেই ন্যস্ত আছে বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই সংবাদও দেওয়া হয়েছে সেই সময় দাজ্জাল অর্থাৎ খৃষ্টবাদের সমর্থক সমস্ত ধর্মের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব, দাজ্জালের উপর বিজয়লাভ থেকে স্পষ্ট যে, অন্যান্য ধর্মের উপরও ইসলাম জয়যুক্ত হবে।

অতএব, জানা গেল যে 'লেইউযহেরাহু আলাদদীনে কুল্লিহি'-এর দ্বারা হল মসীহ মওউদ-এরই যুগকেই বোঝানো হয়েছে। আর আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে প্রায় সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করে। 'তফসীর জামেয়ুল বায়ান'-এর ২৮তম খণ্ডে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে وَذٰلِكَ عِنْدَ نُزُلِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ অর্থাৎ ইসলামের বিজয় ঈসা ইবনে মরিয়মের যুগে সংঘটিত হবে। কেননা সমস্ত ধর্ম যেভাবে নিজেদেরকে এই যুগে প্রকাশ করেছে, তা পূর্বে কখনো হয় নি। অতএব পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের আবিষ্কার এবং পুস্তকাদি প্রকাশে সৌকর্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে সমস্ত ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে এবং অভূতপূর্বভাবে ধর্মের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। রসুলে করীম (সা.)-এর যুগে ইসলামের মোকাবেলায় কেবল চারটিই ধর্ম রুখে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ মক্কার পৌত্তলিকদের ধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, ইহুদী ধর্ম এবং মাজুসীদের ধর্ম। অতএব সেই যুগ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশ পাওয়ার সময় ছিল না, সেই সময় এখন উপস্থিত হয়েছে। কেননা এখন সমস্ত ধর্ম আত্ম-প্রকাশ করেছে এবং যানবাহন, বেতার, সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদির নিত্য-নুতন আবিষ্কারের মাধ্যমে ধর্মসমূহের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ (তার্কিক) আরম্ভ হয়।

মোটকথা কুরআন করীম, হাদীস শরীফ এবং সঠিক যুক্তির মাধ্যমে জানা যায় যে, মিথ্যা ধর্মসমূহের উপর ইসলামের বিজয় বাহ্যিকভাবে মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেই ভবিতব্য ছিল এবং এটিই মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃত কাজ। তিনি ব্যতীত এই কাজটি অন্য কেই করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি এই কার্য সম্পাদন করে তার মসীহ মওউদ হওয়ার বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না। ঘটনাক্রম থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'লা এই কাজ হযরত মির্যা সাহেবের হাতে সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতএব তিনিই মসীহ মওউদ।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বে ইসলাম এমন বিপন্ন সংকটপূর্ণ অবস্থায় ছিল যে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং সেই যুগ সম্পর্কে অবহিত লোকেরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করা আরম্ভ করেছিল যে, অচিরেই ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং পরিস্থিতি এই দিকেই ইঙ্গিত করছিল। কেননা, খৃষ্টধর্ম এত

দ্রুততার সাথে ইসলামকে গ্রাস করে ফেলছিল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ঘোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মুসলমানরা খৃষ্টানদের মোকাবেলায় এমনভাবে পর্যদুস্ত হচ্ছিল যে, নবাগত মুসলিমরা তো দূরে থাক, স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধর অর্থাৎ সৈয়্যদগণদের মধ্যে থেকে হাজার হাজার মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। আর তারা কেবল খৃষ্টান হয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বরং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশ্লীল ও কুরুচিকর পুস্তকাদি প্রকাশ করছিল এবং মেম্বারের উপর দাঁড়িয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র সত্তার উপর এমন সব অপবাদ আরোপ করছিল যা শুনে একজন মুসলমানের হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায়। মুসলমানরা এমন দূর্বল ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, হিন্দু জাতির মত মৃত জাতি যারা কিনা তবলীগের ক্ষেত্রে কখনো সফলতা অর্জন করে নি এবং যারা সর্বদা আত্মরক্ষার চেষ্টাই করে এসেছে, তাদের মধ্যেও এমন দুঃসাহস তৈরী হল যে, আর্যসমাজ নামে একটি সম্প্রদায় ইসলামের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হল। তারা মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করাকে নিজেদের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা প্রচেষ্টাও চালিযে যায়। এর উপমা হল, যেভাবে একজন তীরন্দাজের লাশের উপর শুকুনের দল এসে জমা হওয়ার মত বিষয় যার তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট্য হত না। এক সময় সে তার বাহু-শক্তির ভয়ে তার কাছে ভিড়তেও সাহস পেত না , কিন্তু আজ সে তার তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এবং ভাগ্যের পরিহাস সে তার হাড়ের উপর বসে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।। মুষ্টিমেয় মুসলমান লেখক পর্যন্ত যারা ইসলামের সমর্থনে দন্ডায়মান হয়েছিল, তারা ইসলামের সৌন্দর্য প্রমাণ করার পরিবর্তে একথাস্বীকার করতে আরম্ভ করে যে, ইসলামের আদেশাবলী অন্ধকার যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই কারণে বর্তমান যুগের নিরিখে এগুলির উপর আপত্তি করা উচিত নয়।

এই অভ্যন্তরীন নিরাশার এবং বহিরাগত আক্রমণের সময় হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের সুরক্ষার কাজ আরম্ভ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রথম যে প্রতিআক্রমণ করেন তা শত্রুপক্ষকে হতভম্ব করে দেয়। তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক রচনা করেন যাতে ইসলামের সত্যতার সপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল সহকারে ইসলামের প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানান যে, যদি তারা নিজেদের ধর্ম থেকে এর পঞ্চমভাগ দলিল-প্রমাণও বার করে দেখাতে পারে তবে তাদেরকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। প্রতিপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্বেও কোন শত্রু এই পুস্তকের উত্তর দিতে পারে নি এবং সমগ্র ভারতে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায়। তারা এই কারণে হতচকিত ছিল যে, যে ইসলাম আত্ম-রক্ষাও করতে পারত না তার এমন রুদ্রমূর্তি তারা পূর্বে কল্পনাও করে নি।

সেই সময় পর্যন্ত তিনি (আ.) মসীহ হওয়ার দাবী করেন নি সেই কারণে মানুষের মধ্যে তাঁর বিরোধীতার স্ফুলিঙ্গও ছিল না এবং তারা বিদ্বেষ মুক্ত ছিল। সুতরাং এর ফলে হাজার হাজার মুসলমান প্রকাশ্য একথা বলতে আরম্ভ করে যে, এই ব্যক্তি যুগের মুজাদ্দিদ। লুধিয়ানার এক বুযুর্গ ব্যক্তি যিনি আওলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতেন, তিনি একথা লিখেন যে,

‘ হাম মারীযোঁ কি হ্যায় তুমহিঁ পর নযর,

তুম মসীহ বানো খুদা কে লিয়ে’

অর্থাৎ আমরা অসহায় ব্যধিগ্রস্তরা তোমার দিকে চেয়ে আছি, খোদার দোহাই! তুমি আমাদের পরিত্রাণ কর।

এই পুস্তকটির পর তিনি (আ.) ইসলামের হিফাযত ও সমর্থনে এত বেত বেশি সচেষ্ট ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ইসলাম মৃত নয় বরং জীবিত ধর্ম এবং তারা ইসলামের প্রতিপক্ষে নিজেদের ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেই যুগে যে ধর্মটি নিজেদের সফলতা নিয়ে দম্ভ করত এবং ইসলামকে নিজের শিকার মনে করত, এখন তাদের অবস্থা এমন যে, হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর খাদেমদের নাম শুনে লেজ গুটিয়ে পালায়। আহমদীদের সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তি তাদের কারোর মধ্যে নেই। আজ তাঁরই মাধ্যমে ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত হয়েছে, কেননা যুক্তি-প্রমাণের তরবারী এমন এক অস্ত্র যার প্রতিটি আঘাতই গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং যা সুদূরপ্রসারী।

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, খৃষ্টবাদ পূর্বেই ন্যায় এখনও সমগ্র বিশ্বে নিজেদের একাধিপত্য ও প্রভাব অক্ষুন্ন রেখেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে গেছে, তাদের মেরুদণ্ডও ভেঙ্গে গেছে। প্রথা ও আনুষ্ঠনিকতার প্রভাবের কারণে মানুষ এখনও ইসলামে সেভাবে দলে দলে প্রবেশ করে না যেভাবে প্রবেশ করলে বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষ তাদের মৃত্যুর পদধ্বনি অনুভব করতে পারে। কিন্তু যাই হোক তাদের মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

বিবেকবান মানুষ বীজ দেখেই বৃক্ষ সম্পর্কে অনুমান করতে পারে। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তাদের উপর এমন আক্রমণ করেছেন যে, সেই আক্রমণ কাটিয়ে উঠে পুনর্জীবন লাভ করা দুষ্কর বিষয়। শীঘ্র অথবা বিলম্বে মৃতের স্তুপের ন্যায় ইসলামে পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অনুরূপভাবেই অন্যান্য ধর্মের উপর যে আক্রমণ হেনেছেন তার চূড়ান্ত পরিণামও নিশ্চিত মৃত্যু।

খৃষ্টধর্মের সঙ্গে মোকাবেলা

খৃষ্টধর্মের যাবতীয় সফলতা এই বিশ্বাসের উপর টিকে ছিল যে, হযরত মসীহ (আ.) ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করে মানুষের জন্য সমস্ত মানুষের জন্য প্রাঃশ্চিত্ত করেছেন অতঃপর জীবিত হয়ে আকাশে আরোহণ করে খোদা তা’লার ডানদিকে স্থান গ্রহণ করেছেন। যেভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, একদিকে তাঁর ক্রুশে মৃত্যু বরণ মানুষের মনে ভালবাসার সঞ্চার করে এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর জীবন লাভ করে আকাশে খোদার ডান দিকে গিয়ে আসন গ্রহণ করা জনমানসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও খোদা হওয়ার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই মতবাদটির মূলে কুঠারঘাত করেন এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করে দেখান যে, মসীহ (আ.)-এর ক্রুশে হওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা, ক্রুশে মানুষ তিন দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে এবং ইঞ্জিল অনুসারে হযরত ঈসা (আ.)-কে কেবল চার ঘন্টা পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। ইঞ্জিলে একথাও বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁকে ক্রুশ থেকে

নামানো হয় বল্লমের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে টাটকা রক্ত বেরিয়ে আসছিল। (ইহন্না- ১৯, আয়াত: ৩১-৩৪)। মৃতদেহের শরীর থেকে টাটকা রক্ত বের হয় না। বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিও প্রমাণ করেন যে, হযরত মসীহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে আসবেন। তিনি বলেছিলেন তাদেরকে ইউনুস নবীর মোজেযা দেখানো হবে। যেভাবে তিনি তিন দিন পর্যন্ত মাছের পেটে জীবিত ছিলেন, ঠিক তেমনই ইবনে আদম তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত কবরে থাকবে। (মতি- ১২, আয়াত: ৩৯-৪০) এই ভবিষ্যদ্বাণী এখনও ইঞ্জিলে মজুদ আছে। একথা স্বীকৃত যে, ইউনুস নবী জীবিত মাছের পেটে প্রবেশ করেছিলেন এবং জীবিত অবস্থাতেই বের হয়ে আসেন। অনুরূপ ভাবে হযরত ঈসা (আ.)কেও জীবিত অবস্থায় কবরে নামানো হয় এবং জীবিত অবস্থাতেই কবর থেকে তোলা হয়। যেহেতু সমস্ত দলিল-প্রমাণ ইঞ্জিলের উপরই ভিত্তি করছিল, এই কারণে এই আঘাতের উত্তর খৃষ্টানরা দিতে পারত না আর আজও দিতে পারে না। অতএব, কাফফারা এবং হযরত মসীহর অন্যদের জন্য ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত প্রমাণিত হল, যা আজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে খৃষ্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করছিল। এটিই ছিল খৃষ্টবাদের প্রথম ভিত্তি যা সম্পূর্ণরূপে ভুপতিত হল।

দ্বিতীয় ভিত্তি হল, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত অবস্থায় সশরীরে আকাশে আরোহন করা এবং খোদার ডান দিকে গিয়ে আসন গ্রহণ করার মতবাদ। এই ভিত্তিটিকেও তিনি (আ.) ইঞ্জিলের দলিল-প্রমাণের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। তিনি ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ করে দেখান যে, মসীহ (আ.) ক্রুশের ঘটনার পর আকাশে যান নি বরং ইরান, আফগানিস্তান এবং ভারতে দিকে চলে যান। যেরূপ ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে যে, মসীহ (আ.) বলেন: আমি বনী ইসরাঈলদের হারানো মেষদেরকে একত্রিত করতে এসেছি। (অর্থাৎ আমার আরও অন্যান্য মেষ আছে যারা এখানে নেই, তাদেরকে একত্রিত করা আমার কতর্ব্য) (ইহন্না: ১০:১৬)। ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ব্যাবিলনের সম্রাট বখতে নাসের বনী ইসরাইলদের বারোটি গোত্রের মধ্যে থেকে দশটি গোত্রকে বন্দী অবস্থায় দেশান্তরিত করে আফগানিস্তাদের নিয়ে যায়। অতএব হযরত মসীহ্‌র এই কথা অনুযায়ী আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের দিকে তাঁর আগমণ করা আবশ্যক ছিল যাতে তিনি হারানো মেষদের কাছে খোদার বাণী পৌঁছে দিতে পারতেন। যদি তিনি এদিকে না আসতেন তবে তাঁর নিজের দাবী অনুযায়ী আগমণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত।

হযরত মসীহ (আ.) ইঞ্জিলের সাক্ষ্য ছাড়া ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেও এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি (আ.) খৃষ্টধর্মের প্রাচীন ইতিহাস থেকে প্রমাণ করে দেখান যে, হযরত মসীহর (আ.) শিষ্যগণ ভারতের দিকে যাতায়াত করতেন এবং তিনি (আ.) একথা প্রমাণ করেন যে, তিব্বতে একটি পুস্তক পাওয়া গেছে যার শিক্ষা ইঞ্জিলের শিক্ষার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যার সম্পর্কে দাবি করা হয় যে এটি হযরত মসীহ্‌র জীবন সম্পর্কে। এই পুস্তকটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসীহ (আ.) এই সকল অঞ্চলে অবশ্যই এসেছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি (আ.) একথাও প্রমাণ করেন যে, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের জীবন-শৈলী এবং শহরের নাম এ কথা প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলে ইহুদীরা বসবাস করত। সুতরাং কাশীরের অর্থ (কাশ্মীরের প্রকৃত বাসিন্দাদের ভাষা থেকে যেটি জানা যায়) সিরিয়া সদৃশ দেশ। 'কা'-র অর্থ হল সদৃশ এবং শীর অর্থ সিরিয়া। অনুরূপভাবে কাবুল এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরের নাম সিরিয়ার শহরের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়ও আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের চেহারার হাড়ের গঠনও বানী ইসরাঈলদের চেহারার হাড়ের গঠনের অনুরূপ। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হল তিনি (আ.) ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মসীহর 'কবর' (সমাধি) উদ্ঘাটন করেন যা কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের মহল্লা খানিয়ারে অবস্থিত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এটি একজন নবীর সমাধি যাকে শাহযাদা নবী বলা হত এবং যিনি উনিশ শ' বছর পূর্বে পশ্চিমের দিক থেকে এসেছিলেন এবং কাশ্মীরের প্রবীণ ব্যক্তিরা এটিকে ঈসার কবর বলতেন।

মোটকথা বিভিন্নভাবে পৌঁছানো রেয়াওয়াত ও বর্ণনার মাধ্যমে তিনি (আ.) প্রমাণ করে দেন যে, হযরত মসীহ (আ.) মৃত্যু বরণ করে কাশ্মীরে সমাহিত হয়েছে। এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্‌র পক্ষে وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এই প্রতিশ্রুতি পুর্ণ করেন। অর্থাৎ আমরা ঈসা ও তার মাকে ঝর্ণা বিশিষ্ট একটি পার্বত্য উপত্যকায় আশ্রয় প্রদান করলাম। (আল-মোমিন: ৫১)। এই বর্ণনা কাশ্মীরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মোটকথা মসীহর জীবনের ঘটনাবলী থেকে তাঁর মৃত্যু ও কবর পর্যন্ত খুঁজে বের করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মসীহ্‌র ঈশ্বরত্বের হওয়ার মতবাদটির উপর এমন আক্রমণ করেন যে সেটি চিরতরে ভ্রান্ত ও মিথ্যা অপবাদে পরিণত হয়। খৃষ্টবাদ আর কখনো মাথাচাঁড়া দিতে পারবে না।

সমস্ত ধর্মের জন্য একটিই অস্ত্র

যেহেতু সেই যুগে খৃষ্টধর্ম রাজনৈতিক প্রভাব, ধর্মের প্রসার ও বিস্তৃতি, তবলীগী প্রচেষ্টা এবং শিক্ষাগত উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ধর্মের উপর একাধিপত্য অর্জন করেছিল। এই কারণেই তো আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে বিশেষ অস্ত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের জন্য তাঁকে একটিই অস্ত্র প্রদান করা হয়েছিল যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া কোন ধর্মের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা ইসলামের শিকারে পরিণত হয়েছিল। সেই অস্ত্রটি হল এই যে, প্রত্যেক ধর্মের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা শেষ যুগে একজন সংস্কারকের সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন। এই কারণে সমস্ত ধর্ম একজন নবী বা অবতারের প্রতীক্ষায় ছিল এবং নিজেদের যাবতীয় উন্নতি তাঁরই সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করত। হিন্দুদের মধ্যেও এই ধরণেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, জুরাথিস্ত ধর্মবালম্বীগণ এবং ছোট বড় বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও এই ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল। এই সব ধর্মে সেই প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমণের সময়ও নির্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ সনাক্তিকরণের জন্য সেই যুগ সম্পর্কিত কয়েকটি লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর এই রহস্য উন্মোচন করেন যে, যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং সেগুলিতে যে সমস্ত লক্ষণ ও বৈশিষ্টাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সবই একে অপরের সঙ্গে সদৃশপূর্ণ। যদি কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে কয়েকটি অতিরিক্ত লক্ষণাবলী বর্ণিত হয়েছে তবুও সেগুলি এই যুগের প্রতিই ইঙ্গিত করছে অন্য সব লক্ষণগুলি যেদিকে ইঙ্গিত করছে। অতএব এই সকল নবী বা অবতারগণের একই যুগে আসা ভবিতব্য।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীগুলি হাজার হাজার বছর পর এই যুগে পূর্ণ হওয়া প্রমাণ করছে যে, এগুলি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ছিল, মানুষ বা শয়তানের পক্ষ থেকে ছিল না। অপরদিকে একই যুগে প্রত্যেক জাতির ও ধর্মের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একজন নবী বা অবতার আসবেন যাদের কাজ হবে সেই জাতিকে অন্যান্য জাতির উপর জয়যুক্ত করা অর্থাৎ খোদার নবীগণ একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করবেন - এমন দাবিও যুক্তি সঙ্গত নয়। আর প্রত্যেক জাতির অন্য জাতির উপর বিজয় লাভ করাও সম্ভব নয়। অতএব একদিকে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীগুলির খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সত্য প্রমাণিত হওয়া এবং অপরদিকে বিভিন্ন সত্তার মধ্যে এগুলি পূর্ণ হয়ে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের কারণ হওয়া বরং অযৌক্তিক বিষয় হওয়া একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃতপক্ষে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে এক ও অভিন্ন সত্তা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র তা'লার উদ্দেশ্য ছিল, সর্বপ্রথম বিশ্বের সমস্ত জাতিকে এক ও অভিন্ন সত্তার আগমণের জন্য প্রতীক্ষা করানো এবং সেই সত্তার আগমণের পর তাঁর দ্বারা ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সেই সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে ইসলামে প্রবেশ করানো এবং ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের উপর জয়যুক্ত করা। অতএব মাহদী, মসীহ, কৃষ্ণ, এবং জুরাথুস্ট একই সত্তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। অনুরূপভাবে অন্যান্য জাতির প্রতিশ্রুত পুরুষ সেই একই ব্যক্তি ছিলেন। মোটকথা বিভিন্ন নামের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বিভিন্ন জাতি যেন নিজেদের নবীগণের কাছ থেকে নিজের ভাষায় সংবাদ পেয়ে সেই প্রতিশ্রুত পুরুষকে নিজের বলে স্বীকার করতে পারে, যেন বিজন না মনে করে। এবং অবশেষে সেই নির্ধারিত যুগে প্রতিশ্রুত পুরুষ আবির্ভুত হলে সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে তাঁর সত্যতা স্বীকার করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে।

এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধির উপমা হল, কোন ব্যক্তি জাতিসমূহকে পরস্পর যুদ্ধ করতে দেখে সে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে তারা যেন সালিশির মাধ্যমে মীমাংসা নিজেদের মীমাংসা করে নেয় এবং তারা নিজেদের সালিশ নির্ধারণ করে ফেললে জানা যায় যে, একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং তার সিদ্ধান্তে সকলের মীমাংসা হয়ে যায়।

মোটকথা বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত পুরুষ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেগুলি এই যুগে পূর্ণ হয়েছে- একথা প্রমাণ করার পর এবিষয়টি প্রমাণ করা অসম্ভব যে, একই সময়ে একাধিক প্রতিশ্রুত পুরুষ আসবেন যাদের উদ্দেশ্য হবে পৃথিবীতে সত্যের প্রসার করা এবং নিজের জাতিকে অন্যান্য জাতির উপর জয়যুক্ত করা। তিনি (আ.) প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত ধর্ম একজন প্রতিশ্রুত পুরুষকেই বিভিন্ন নামে সম্বোধন করছিল এবং তিনিই সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ।

প্রত্যেক ধর্মে একজন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং তাঁর সম্পর্কে যে সকল লক্ষণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলি এই যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু তিনি (আ.) ভিন্ন অন্য কোন দাবিদার দণ্ডায়মান হয় নি। অতএব, হয় মানুষ নিজেদের ধর্মকে মিথ্যা জ্ঞান করুক নচেত স্বীকার করতে বাধ্য হোক যে, ইসলামের প্রতিশ্রুত মসীহ-ই ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর উপর ঈমান আনুক। সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছে এই দুটি পথ ছাড়া ভিন্ন পথ অবশিষ্ট নাই এবং উভয় পরিস্থিতিতে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। কেননা, অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যদি নিজেদের ধর্মকে মিথ্যা মনে করে ত্যাগ করে সেক্ষেত্রেও বিজয় ইসলামেরই হবে। তাদের ধর্মকে সত্য প্রমাণ করতে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগের সংস্কারককে গ্রহণ করলেও ইসলামেরই জয় হয়।

ক্রমশঃ এই আক্রমণ যখন অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে প্রভাব ফেলবে তখন তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র কেবল ইসলামেরই জয়ধ্বনি মুখরিত হবে। প্রতিশ্রুত মসীহ নবীদের রীতি অনুযায়ী কেবল বীজ বপন করেছেন। বৃক্ষ সময়ে ফল দিবে এবং বিশ্ব এই বৃক্ষের সুমিষ্ট ফলের গুণগ্রাহী হয়ে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে বাধ্য হবে।

****

ইমাম মাহদী এসে গেছেন : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণের ঘোষণা

মাসিক মদিনার বিজ্ঞ লেখক কয়েকজন ইসলামি বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের কথা বলেছেন যারা ঘোষণা করেছেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেছে বা তাঁর আগমণ অতি নিকটে। ঘোষণাগুলি নিম্নরূপঃ

ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীর মওলান মোহাম্মদ মঈজ উদ্দীন হামিদী সাহেব, খূলনা-এর ঘোষণ অভিন্ন পাকিস্তান থাকাকালীন ১৯৭০ সালে তৎকালীন রাজশাহী জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জ বালিয়া ডাঙ্গ নামে একটি গ্রামে এক বৃহত ধর্মীয় জলসায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ধর্মানুসারীদে উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন যে, ইমাম মাহদীর জন্ম হয়ে গেছে। পীর সাহেব ইমাম মাহদী জন্ম কোথায় হয়েছে বা কখন হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। (মাসিক মদিনা , জানুয়ারী, ২০০৪)

২) সৌদী আরব থেকে আগত তবলীগ জামাতের আমীর বলেন ইমাম মাহদী দরজায় কড়া নাড়ছেন। (মাসিক মদিনা, জানুয়ারী, ২০০৪)

৩) ইসলামী চিন্তাবিদ ফুরফুরা শরীফের পীর মোহাম্মদ আব্দুল হাই সিদ্দিকি সাহেব ১৯৮৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন যে, ইমামা মাহদীর জন্ম হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় বা কখন হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছুই জানান নি। (মাসিক মদিনা, জানুয়ারী, ২০০৪)

মসীহ এর অবতরণের প্রকৃত অর্থ ও মসীহ ও মাহদীর কতিপয় ক্রিয়াকলাপ তথা তাঁর সত্যবাদীতার কতিপয় প্রমাণ

অতএব প্রত্যেককে ,মুসলমান বলে গণ্য সকলকে এই বিষয়ের উপর বিবেচনা করা উচিত । এবং আমাদেরও তাদেরকে বোঝানো উচিৎ।আর নামধারী উলেমাদের সঙ্গে সেসব বিতর্কে জড়ানোর প্রয়োজন নাই যে আগমনকারী মসীহ এখনও আসেনি , কিম্বা তিনি অমুক স্থানে অবতীর্ণ হবেন অর্থাৎ মাহদী অমুক স্থানে আসবেন।প্রকৃতপক্ষে যেপ্রকারে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি উপস্থাপন করা হয় সেটা একটা হাদিসকে না বোঝার কারণে।এই বর্ণনাটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এরূপে ব্যাখ্যা করেছেন , তিনি বলেন:-"যদি একথা বলা হয় যে হাদিস পরিস্কার ও সুস্পষ্ট শব্দে বলে দিচ্ছে যে মসীহ ইবনে মরীয়ম আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে এবং দামাশকের পূর্বে মিনারের নিকট তাঁর অবতরন হবে ,তিনি দুই জন ফিরিস্তার কাঁধের উপর হাত রেখে অবতরন করবেন ,তবে এই সুস্পষ্ট বর্ণনাকে অস্বীকার করা হবে কেন? (অর্থাৎ এই সব লোকেরা বলে যে সুস্পষ্ট ও পরিস্কার বর্নণা রয়েছে এটাকে কিরূপে প্রত্যাখ্যান করা যায়)অতএব এর প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন:-" এর উত্তর হল এই যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া এই বিষয়টিকে প্রমাণ করে না যে বাস্তবেই পার্থিব সত্বা

আকাশ থেকে নেমে আসবে বরং সহী হাদীসে আকাশ শব্দটিই নাই।আর এমনিতেই অবতরন(নুজুল) শব্দটি একটি সাধারণ শব্দ।যে ব্যক্তি এক স্থান থেকে যাত্রা করে অন্যত্র গিয়ে অবস্থান করে সেটাকেও আমরা বলি যে সেখানে নেমেছে বা অবতরন করেছে।যেমন বলা হয় অমুক স্থানে সৈন্য বাহিনী নেমেছে বা তাঁবু নেমেছে।এর দ্বারা কি এটা বোঝা যায় যে সেই সেনা বাহিনী বা তাঁবু আকাশ থেকে নেমেছে। তাছাড়াও আল্লাহ তায়ালা কুরান মজীদে পরিস্কার বলেছেন যে আঁ হযরত(সাঃ) ও আকাশ থেকেই অবতরন করেছেন ।শুধু তাই নয় একস্থানে বলেছেন যে আমরা লোহাও আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছি। অতএব স্পষ্ট যে এই

আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সেরূপে নয় যেরূপ সাধারণ মানুষ ধারণা করে রেখেছে।

(ইজালা আওহাম, রুহানী খাজাইন তৃতীয় খন্ড পৃঃ ১৩২-১৩৩) হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেন হাদিসগুলি এবিষয়ের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে।মানুষ নিজে তো এত জ্ঞান রাখেনা অপরদিকে উলেমাগণ ভুল পথ প্রদর্শন করে।তিনি(আঃ) আরও বলেন " এই কারণে ইহুদীরাও ভ্রান্তিতে পড়েছিল।এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে গ্রহন করেনি।" অতএব যাইহোক এগুলি দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার বিষয়, খুতবার মধ্যে বর্ণিত হওয়া সম্ভব নয়।এখন যেভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে , আহমদীদেরও উচিৎ এই বিষয়গুলি স্পষ্ট করে নিজেদের পরিবেশে বর্ণনা করা।যাতে যত দূর সম্ভব এবং যতগুলি সৌভাগ্যবান আত্মার রক্ষা পাওয়া সম্ভব রক্ষা পাক, যত সংখ্যক ভদ্র ও সুশীল মানুষ বাঁচা সম্ভব বেচে

যাক।আহমদীরা নিজের নিজের কলোনীতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সুস্পষ্টভাবে বোঝান যে প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষানুযায়ী যার আগমনবার্তা ছিল সে এসে গিয়েছে।হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:-

"এখন আমি দর্শকদের সামনে সেই হাদিস উপস্থাপন করব যেটা আবু দাউদ তাঁর সহী হাদিসে লিখেছেন এবং সেই হাদিসের সত্যায়নকারীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবো।অতএব প্রকাশ থাকে যে এই ভবিষ্যদ্বানী যা আবু দাউদ -এর সহীতে লিপিবদ্ধ আছে যে,হারিস নামে এক ব্যক্তি অর্থাৎ হাররাসুন মা ওরাউননাহার থেকে (অধিক হারে কর্ষণকারী এক ব্যক্তি যিনি নদীর অপর প্রান্ত থেকে আসবেন।)অর্থাৎ সমর কন্দ-এর দিক থেকে বের হবেন যিনি রসুলের বংশধরদেরকে শক্তিশালী করবেন। যাকে সহায়তা ও সহযোগীতা করা প্রত্যেক মোমিনের জন্য অনিবার্য হবে।ঐশীবাণীর মাধ্যমে আমার নিকট উন্মোচিত করা হয়েছে যে, এই ভবিষ্যদ্বানী এবং মসীহর আগমনের ভবিষ্যদ্বানী যিনি মুসলমানদের ইমাম এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হবেন, প্রকৃতপক্ষে দুটি ভবিষ্যদ্বানী বিষয়গত ভাবে এক ও অভিন্ন।এবং দুটি ভবিষ্যদ্বানীর সত্যায়নকারী এই অধম।মসীহের নামে যে ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে তার বিশেষ লক্ষণাবলী প্রকৃতপক্ষে দুটিই। এক এই যে যখন সে মসীহ আসবে তখন মুসলমানদের আভ্যন্তরীন দশা, যা সেসময় যারপরনায় শোচনীয় হবে ,

তিনি তাঁর সঠিক শিক্ষা দ্বারা সংশোধন করবেন।" এই সম্পর্কে পূর্বের খুতবাগুলিতেও উল্লেখ হয়ে গেছে ।এরা নিজেরাই স্বীকার করে যে মুসলমানদের অবস্থা বিপন্ন।এবং কোন সংশোধনকারীর প্রয়োজন অনুভব করছে।

(খুতবাতে মাসরূর)

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর সপক্ষে আসমানী সাক্ষ্য

তাঁর সত্যতার আরও একটি আসমানী সাক্ষ্যও আছে যা সম্পর্কে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম।অর্থাৎ চাঁদ ও সূর্যকে গ্রহন লাগা।এটা এমন একটা নিদর্শন যাতে মানুষের প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা।আঁ হযরত (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে যেরূপ সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন এবং আমাদেরকে বলেছিলেন । বিজ্ঞান যদিও অনেক উন্নতি করেছে আজকের যুগেও এত সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বানী করা করা সম্ভব নয়, যে রমজানের অমুক তারিখে হবে বা অমুখ তারিখে সূর্য গ্রহণ লাগবে।আর অমুক তারিখে চন্দ্র গ্রহণ লাগবে। হাদিসে আছে-

আমার মাহদীর সত্যতার জন্য দুটিই নিদর্শন আছে এবং যে যাবৎ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সত্যতার এই নিদর্শন অন্য কারোর জন্য প্রকাশ পায়নি।রমজানে চন্দ্র গ্রহণের রাতগুলির মধ্য থেকে প্রথম রাতে চাঁদে এবং সূর্য গ্রহণের দিনগুলির মধ্যবর্ত্তী দিনে সূর্যকে গ্রহণ লাগবে।সুতরাং এই গ্রহণ ১৮৯৪ সনে সংঘটিত হয় এবং ১৩,১৪,১৫ তারিখের মধ্য থেকে ১৩ রমজান চন্দ্র গ্রহন হয় এবং ২৭,২৮,২৯ তারিখের মধ্য থেকে ২৮ রমজান সূর্য গ্রহণ হয়।এটা তাঁর সত্যতার একটি সুস্পষ্ট দলিল।হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন যে আমি ছাড়া এই সময় আর কারও দাবীও ছিল না।কিছু মৌলভী "কমর" ও ইত্যাদি বিতর্কে জড়ায়। কারো নিকট দ্বিতীয় রাতের পরের চাঁদ আবার কারো কাছে তৃতীয় রাতের চাঁদকে কমর বলা হয়।এখন কেউ দেখাক যে সমর্থনস্বরূপ এই নিদর্শন প্রকাশের পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ভিন্ন আর কারোর দাবী ছিল কি। কেবল একজন ব্যক্তিই দাবি করেছিলেন তিনি হলেন হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)।হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলেছেন যে অজস্র লক্ষণাবলী পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে। আমি ছাড়া যদি অন্য কেউ এসে থাকে তবে তা দেখাও।কেননা সময় অবশ্যই এর দাবী করছে।কিন্তু এরা দেখাতে পারবেনা,অতএব

অবশিষ্ট শেষ পৃষ্ঠায়

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর শিক্ষাবলীর সারসংক্ষেপ।

তিনি বলেন:-"আমাদের ধর্মের সারতত্ব এবং নির্যাস হল লা ই লাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ , আমাদের বিশ্বাস যা আমরা এই পার্থিব জীবনে পোষণ করি যার সঙ্গে আমরা আল্লাহ তায়ালার কৃপায় এই ইহ জগত থেকে প্রস্থান করব"(অর্থাৎ এই বিশ্বাসের সঙ্গেই আমরা এই পৃথিবী ত্যাগ করব)"যে হযরত সৈয়্যদনা ও মৌলানা মহম্মদ মুস্তাফা(সাঃ) খাতামাননাবীঈন ও খাইরুল মুরসালীন যার হাতে দ্বীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।এবং সকল কল্যানরাজি পরিপূর্ণ হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথ অবলম্বন করে খোদা তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।"

(ইজালা আওহাম , রুহানী খাজাঈন তৃতীয় খন্ড পৃঃ১৬৯-১৭০)

অতএব এটি আমাদের ঈমানের অংশ এবং হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। তাই যার এইরূপ ঈমান তার সম্পর্কে কিভাবে বলা সম্ভব যে তার মাধ্যম ছাড়া খোদা তায়ালা পর্যন্ত পৌছে গেছে বা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন :-" একমাত্র দ্বীনে ইসলাম সরল ও সুদৃঢ় পথ। এখন আকাশের নিচে একটি মাত্রই নবী রয়েছে এবং একটিই মাত্র কিতাব রয়েছে ।অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ(সাঃ) যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং সকল নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত রসুলের থেকে পূর্ণতম এবং খাতামুল আম্বিয়া এবং পুরুষোত্তম , যাঁর অনুসরনে খোদা তায়ালাকে পাওয়া যায়।এবং অন্ধকারের আবরণ অপসারিত হয় এবং ইহলোকেই প্রকৃত মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়।এবং কুরআন শরীফ যা সত্য ও পরিপূর্ণ হেদায়ত এবং গুণাবলীতে পরিপূর্ণ , যার মাধ্যমে চির সত্যের জ্ঞান ও তত্ব জ্ঞান অর্জিত হয় এবং মানবীয় কলুষতা থেকে অন্তর পবিত্রতা লাভ করে এবং মানুষ অজ্ঞতা, উদাসীনতাও সন্দেহের আবরণ থেকে মুক্তি লাভ করে পূর্ণ বিশ্বাসের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়।" (বারাহীনে আহমদীয়া,)

অর্থাৎ এখন যা কিছু অর্জিত হবে আঁ হযরত(সাঃ) এর মাধ্যমেই অর্জিত হবে।এবং তাঁর উপরই নবুয়ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাঁর ই শিক্ষার মাধ্যমে যত অন্ধকার ছিল তা দূরীভুত হয় ও জ্যোতি লাভ হয়। এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য তাঁরই মাধ্যমে অর্জিত হবে এবং প্রকৃত মুক্তিও তাঁরই মাধ্যমে পাওয়া যাবে।এবং তাঁরই আনীত শিক্ষার মাধ্যমে অন্তরের সকল কলুষতা দূরীভুত হবে। তিনি আরও বলেন:-" আমাদের নবী(সাঃ) সত্যের বিকাশের জন্য এক মহান সংস্কারক ছিলেন। যিনি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্যতাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনেন। এই গর্বে আমাদের নবী(সাঃ) এর সঙ্গে কোনো নবী অংশীদার নেই।তিনি সমগ্র জগতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পেয়েছেন ,কিন্তু তাঁর আবির্ভাবে সেই অন্ধকার, জ্যোতিতে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তিনি (সাঃ) যে জাতির মধ্যে আবির্ভুত হন ,তাদের সমগ্র জাতি শিরকের খোলস বর্জন করে একত্ববাদের পোশাক পরিধান না করা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু বরণ করেননি। এবং শুধুমাত্র তাই নয় বরং তারা ঈমানের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যান।এবং তাদের মাধ্যমে বিশ্বাস ও আনুগত্য ও সততার এমন সকল কর্ম সংঘটিত হল যার নজির পৃথিবীর কোনো প্রান্তে পাওয়া যায়না। এই অসাধারণ সফলতা আঁ হযরত(সাঃ) ভিন্ন আর কোনো নবীর সৌভাগ্য হয়নি।আঁ হযরত(সাঃ) এর নবুয়তের এটাই বড় প্রমাণ যে, তিনি(সাঃ) এমন এক যুগে আবির্ভুত হয়েছিলেনযখন যুগ অনন্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এবং স্বাভাবিকরূপেই একজন মহান সংস্কারকের অভিলাষী ছিল।এবং তিনি এমন সময় পৃথিবীতে থেকে প্রত্যাগমন করলেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ করে একত্ববাদ ও সত্যপথ অবলম্বন করে নিয়েছিল।এবং প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণ সংশোধন তাঁর(সাঃ)ই সঙ্গে বিশিষ্ট ছিল, কেননা তিনি(সাঃ) এক হিংস্র চরিত্র ও পশু প্রবৃত্তি বিশিষ্ট জাতিকে মানবীয় সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন।"

(যে জাতি হিংস্র পশু তুল্য এবং পশুর ন্যয় জীবন যাপনকারী ছিল তাদেরকে মানবীয় শিষ্টাচার শেখান) " কিম্বা ভিন্ন বাক্যে এরূপ বলা যায় যে পশুদেরকে মানুষে পরিণত করলেন। এবং মানুষ থেকে শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেন এবং শিক্ষিত মানুষ থেকে খোদা প্রাপ্ত মানুষে পরিণত করলেন, এবং আধ্যাত্মিকতার রসদ তাদের মধ্যে সঞ্চার করলেন এবং সত্য খোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তৈরী করলেন। খোদার রাস্তায় তারা ছাগলের ন্যয় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।এবং পিপীলিকার ন্যয় পদতলে পিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঈমানকে নষ্ট হতে দেয়নি বরং প্রত্যেক বিপদের সময় সামনের দিকেই অগ্রসর হয়েছে।অতএব নিঃসন্দেহে , আমাদের নবী (সাঃ) আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আদম ছিলেন।বরং তিনিই প্রকৃত আদম ছিলেন যার মাধ্যমে ও যার কল্যাণে সমস্ত মানবীয় শ্রেষ্ঠতা ও গুণাবলী উৎকষর্তার শীর্ষে পৌঁছেছিল। এবং সমস্ত শুভ শক্তি নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত হয়ে গেল। এবং মনুষ্য স্বভাবের কোনো শাখা ফুল ও ফল হীন রইল না। এবং খাতমে নবুয়তের মর্যাদা তাঁর(সাঃ) যুগ পশ্চাদকাল হওয়ার কারণে অর্জিত হয়নি বরং এই কারণেও যে নবুয়তের চরম উৎকর্ষতা তাঁর(সাঃ) উপর সম্পন্ন হয়েছে। আর যেহেতু তিনি(সাঃ) আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশক ছিলেন এই জন্য তাঁর(সাঃ) বিধান প্রতাপ(শৌর্য) এবং সৌন্দর্য্য উভয় গুণের ধারক ছিল। এবং তাঁর দুটি নাম মুহম্মদ ও আহমদ(সাঃ) এইকারণেই । তাঁর সাধারণ নবুয়তে কোনো অংশে কৃপণতা ছিলনা, বরং প্রথম থেকেই তা সারা বিশ্বের জন্য ছিল। (লেকচার শিয়ালকোট, রুহানী খাজায়েন খন্ড ২০, পৃঃ ২০৬-২০৭) এই হচ্ছে জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা যে আঁ হযরত (সাঃ) এর কল্যানরাজি আজও প্রতিষ্ঠত আছে।

তিনি (আঃ) বলেন:-

" আঁ হযরত (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া।অর্থাৎ আমাদের নবী (সাঃ) এর পরে আর কোনো নতুন শরিয়ত , নতুন ধর্ম গ্রন্থ , নতুন আদেশমালা আসবেনা।(আর এরা বলে নতুন শরীয়ত এনেছে এবং মির্যা গোলাম আহমদকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে।)

" এই গ্রন্থ এবং এই আদেশাবলীই বলবৎ থাকবে। আমার পুস্তকে নবী ও রসুলের বিষয়ে আমার সম্পর্কে যে কথা পাওয়া যায় তার উদ্দেশ্যে কখোনোই এটা নয় যে কোনো নতুন শরিয়ত(বিধান) বা আদেশাবলী শেখানো হবে।বরং উদ্দেশ্যে এটাই যে আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বাস্তবিক প্রয়োজনের সময় কাউকে প্রত্যাদিষ্ট করেন তখন তাঁকে আল্লাহ তায়ালা নিজের সাথে বাক্যালাপের সম্মান প্রদান করেন। এবং তাঁকে অদৃশ্যের সংবাদ দেন। এই অর্থে নবী শব্দ ব্যবহার করা হয়।" (যার সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা অধিকহারে সংলাপ করবেন তার জন্য নবী শব্দ ব্যবহার করা হয়।) " এবং সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি নবীর উপাধি পায়। অর্থ এই নয় যে নতুন শরিয়ত প্রদান করবেন বা আঁ হযরত(সাঃ) এর শরিয়তকে রহিত করবেন ।নাউজুবিল্লাহ।"

(এই অপবাদ আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।) " বরং এগুলি যা কিছু সে প্রাপ্ত হয় , আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রকৃত ও পূর্ণ আনুগত্যের ফলে প্রাপ্ত হয়।এবং সেটা ভিন্ন পাওয়া সম্ভবই

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সত্য দাবীকারী। কেননা জাগতিক এবং আসমানী সমর্থন তাঁর সপক্ষে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত নবুয়তের মাপদন্ড তাঁর সমর্থন করছে।অতীতেও কিছু লোক নিজেরাই স্বীকার করেছিল যে তিনি (আঃ) পুত ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর(আঃ) পূর্বের জীবনও যৌবনকাল ও পুত ও পবিত্র ছিল। বিদ্বান ও ছিলেন এবং ইসলামের সেবা তাঁর থেকে বেশি আর কেউ করেনি।একথা অন্যেরাও স্বীকার করেছে।কিন্তু সমস্ত কিছু দেখার পরও যদি বিবেক পর্দাচ্ছন্ন হয়ে থাকে তবে আল্লাহই তাদের রক্ষক।কেননা কাউকে মান্য করার সৌভাগ্যও আল্লাহ তায়ালার ফজলেই লাভ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:-

“এখন বলুন যদি এই অধম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে কে চতুদর্শ শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেছে? বিরোধীদের মোকাবিলায় দন্ডায়মান হয়েছে যেরূপ এই অধম (অর্থাৎ বিবেচনা কর, একটু লজ্জা কর,আল্লাঅধম মসীহ মওউদ হওয়ার দাবীতে কোনো ভ্রান্তিতে থাকে তবে আপনারা একটু চেষ্টা করুন মওউদ যিনি আপনাদের বিবেচনায় আছেন বর্তমান সময়ের মধ্যেই আকাশ থেকে নেমে আসুক কেননা আমি তো এখন বর্তমান আছি। অতএব সে আকাশ থেকে নেমেই আসুক। এটা তিনি সেই সময় সকলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলেন।তবে সকলে মিলে দোয়া করুন যে,আপনারা সত্যের উপর থাকেন তবে এই দোয়া গৃহীত হবে মোকাবিলায় গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু আপনারা অবশ্যই জেনে রাখবেন যেহবেনা।কেননা আপনারা ভুল পথেনা।এখন আপনাদের এই কাল্পনিক আশা কক্ষোনো পূর্ণ হবেনা। এই যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে কিন্তু এদের মধ্য থেকে কেউই মসীহকে অবতরণ করতে দেখবেনা।

(ইযালায়ে আওহাম)

৩৮-এর পাতার পর.....

নয়।”

(আল হাকাম ১০ জানুয়ারী , ১৯০৪)

অতএব যখন দাবীকারী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন যে আমি সমস্ত কিছু তার থেকে অর্জন করছি এবং তিনি ছাড়া কোনো কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এবং তাঁর মান্যকারীরাও এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে যে ইনি

আঁ হযরত(সাঃ) এর প্রকৃত ভৃত্য, তবে এই মিথ্যারোপ এবং অসত্যের উপর ভিত্তি করে সাজানো কথা বার্তা মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু নয়। আর এমন লোকজন সবসময় এটা করেই থাকে। অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করা ছাড়াও এই শয়তানি শক্তিগুলিকে (শয়তান তো সর্বদা সঙ্গে লেগে থাকে) ঈর্ষার আগুন গ্রাস করতে থাকে। এরা জামাতের উন্নতি দেখতে পারেনা।এদের চোখে জামাতের উন্নতি বিঁধতে থাকে। এরা যত খুশি জঘন্য আচরণ করুক , পূর্বেও এরা করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো করতে থাকবে। এই ধরণের মানুষ জন্ম নিতে থাকবে, শয়তান বহাল থাকবে, এই উন্নতি এদের নোংরা গতিবিধির কারণে স্তব্ধ হয়ে যাবেনা। ইনশাল্লাহ । (খুতবাতে মাসরূর)

হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর আঁ হযরত (সাঃ) প্রতি ভালবাসা

আল্লাহ তায়ালার ফজলে আমাদের অন্তরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা এই সকল লোক যারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগও ও অপবাদ দেয় তাদের চাইতে লক্ষ কোটি অংশ বেশি । আর এসব কিছু আমাদের অন্তরে রয়েছে আঁ হযরত(সাঃ) এর এই সুন্দর শিক্ষার কারণে যার চিত্রায়ন হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) করেছেন।হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) যেটিকে সুন্দররূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।কোনো আহমদী(নাউজুবিল্লাহ) একথা কল্পনা করতে পারেনা যে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর মর্যাদা আঁ হযরত (সাঃ)এর থেকে বেশি।হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর আঁ হযরত (সাঃ) এর ভালবাসায় এমন বিভোর ছিলেন যে হুসসান বিন সাবিত(রাঃ) এর এই পংক্তিটি পড়তে পড়তে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে যেত। (দিওয়ান হযরত হুসসান বিন সাবিত (রাঃ) তুমি আমার নয়নের তারা ছিলে , যা তোমার মৃত্যুর পর অন্ধ হয়ে গিয়েছে।এখন তোমার মৃত্যুর পর যে কেউ মৃত্যু বরণ করুক, আমি তো কেবল তোমার মৃত্যুর ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম।হযরত মসীহত মওউদ(আঃ) বলতেন কতই না ভাল হতো যদি এই পংক্তিটি আমার হত।তাই এমন ব্যক্তির সম্পর্কে একথা বলা একটা অতি জঘন্য অপবাদ যে (নাউজুবিল্লাহ) তিনি নিজেকে আঁ হযরত (সাঃ) এর থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতেন বা তাঁর মান্যকারীরা তাঁকে আঁ হযরত(সাঃ) এর থেকে উচ্চ মর্যাদা দেয় । আমরা তাঁকে আঁ হযরত (সাঃ)এর ভালবাসায় পদে পদে বিভোর হতে দেখি।এক স্থানে তিনি বলেন:–আমি সেই জ্যোতির কাছে উৎসর্গীত, তার থেকেই আমি নির্গত হয়েছি। সেই জ্যোতির নিকট আমি অতি তুচ্ছ বস্তু , এটাই আসল সিদ্ধান্ত। (কাদিয়ান কে আর্য অউর হাম) অতএব যে ব্যক্তি তার সমস্ত কিছু সেই জ্যোতির কাছে বিলীন করে দিচ্ছে তার সম্পর্কে একথা বলা যে (নাউজুবিল্লাহ) তিনি বলেছেন আঁ হযরত (সাঃ)এর মর্যাদার অবনমন হয়েছে , এবং মির্যা কাদিয়ানীর মর্যাদা উচ্চতর হয়েছে , এবং আহমদীদের নিকট হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আঃ) শেষ নবী এবং আমরা একথা বলেছি যে এটা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস যে তিনি শেষ নবী , এখন আমরা পত্রিকাকে খোলা চিঠি দিয়েছি যে (নাউজুবিল্লাহ) তোমরা আঁ হযরত (সাঃ) এর কার্টুন তৈরী কর। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন ওয়া লানাতাল্লাহে আলাল কাযেবিন। এবং আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত হোক মিথ্যাবাদীদের উপর।এটা অত্যন্ত শিশুসুলভ বিষয় ,তারা যেন আমাদের কথা ও আমাদের বলার অপেক্ষায় ছিল আমরা অনুমতি দিলেই কার্টুন প্রকাশিত করবে। অথচ যেখানে ডেনমার্কে আমাদের সংখ্যা মাত্র কয়েক শত।সংবাদ প্রকাশ করার পূর্বে এই উর্দু পত্রিকা গুলির কিছটা বিবেচনা করা উচিত।

(খুতবাতে মাসরূর)